KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ১৩ নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড,
Collection : KLMLGK	Publisher : বিক্রম মুখোপাধ্যায়
Title : পত্রিকা	Size : 6" x 9.5" 15.24 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5-6	Year of Publication : ভাদ্র, ১৩৮৫ আশ্বিন, ১৩৮৫ কার্তিক, ১৩৮৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫ পৌষ-মাঘ, ১৩৮৫
	Condition : Brittle ✓ / Good
Editor : বিক্রম মুখোপাধ্যায় জ্যোতির্ময় রায়	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
পত্রিকা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

"ছান্দসিকী"

দিলীপকুমার রায়

বাংলা দেশ কবির দেশ, অথচ এখানে ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে খুব কমই। প্রথমটায় একথা ভাবতে একটু আশ্চর্য লাগতে পারে, কিন্তু এর কারণ বোধগম্য। সবাই জানেন যে অন্য সব শিল্পের সঙ্গে কাব্যশিল্পের একটা মস্ত প্রভেদ এইখানে যে কাব্যশিল্পের আঙ্গিক (technique) সম্বন্ধে কবিদের মন খুব কম ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় হ'য়ে থাকে। তার কারণ কাব্যের আঙ্গিক হ'ল ভাষা, আর ভাষার রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে প্রায় মিশিয়ে থাকে। এই জন্যে কোনো দেশেই কাব্য ও ছন্দের মালমশলা নিয়ে কবিরা ততটা মাথা ঘামান না যতটা মাথা ঘামান (ধরা যাক) গুণী স্বরতালের অন্ধিসন্ধি নিয়ে, চিত্রী রেখা রঙ আনাটমির তথ্য নিয়ে, ভাস্কর ধাতু বা পাথরের মতিগতি নিয়ে। সেই জন্যেই ওদেশের একজন ছান্দসিক লিখেছেন: "There is no other art in which genius may be so far unaware of the laws and materials by which and in which it works."

সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সমান সত্য যে আধুনিক মনের একটি মূল প্রবর্ধমান প্রবণতা এই বিশ্লেষণ ব্যবচ্ছেদেরই দিকে: সে জানতে চায়, আরো জানতে চায়, তন্ন তন্ন করে' খুঁটিয়ে না জানলে তার তৃপ্তি নেই। কেননা এই সন্ধিৎসা—খুঁটিনাটি নিয়ে এই দুর্দম্য উৎসাহ—এর তাগিদ আসে জ্ঞানলোক থেকে। জানব, আরো জানব, আরো জানব—বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিরও ভিৎও তো এখানেই। কাজেই "আগে জানতে চাইতাম না—এখন কাজ কি জেনে?"—এ প্রশ্ন এ-যুগে শুধু অচল নয়—অসঙ্গত, এতই অসঙ্গত যে এর উত্তর দেওয়ারও দরকার করে না। এ হ'ল সেই জাতীয় প্রশ্ন যা—ওদের ভাষায়—"carries its own reputation. শ্রীঅরবিন্দর কাছে ইংরাজি ছন্দ শিখতে গিয়ে ইংরাজি ছন্দের আঙ্গিক সম্বন্ধে তাঁর অগাধ জ্ঞান দেখে যখন মুগ্ধ হই তখন তাঁর একটি কথা প্রায়ই মনে হ'ত: "We are the sons of an intellectual age."

সেই থেকে ছন্দ নিয়ে আরো ভাবতে সুরু করি। এমন দিন গেছে যে ছন্দের বিষয় ভাবতে ও পরীক্ষা করতে করতে পুব দিকে সোনার আলো চিক্ চিক্ করে' উঠেছে—সারাদিন পড়াশুনোর পরে ক্লান্তদেহে শুতে গিয়ে মাঝরাতেও মনে জেগেছে কল্লোলিত ছন্দের দোলা যাকে

---

* শ্রীদিলীপকুমার রায় "ছান্দসিকী" (যন্ত্রস্থ) নাম দিয়ে একটি বড় বাংলা বই লিখেছেন—(Bengali Prosody)—আমাদের অনুরোধে তার এই ভূমিকাটি তিনি পাঠিয়েছেন—ইতি প. স.

কাব্যে তর্জমা না করে' ঘুম আসেনি। শেক্ষপীয়রের একটি কথা আছে: "Some are born great, some attain greatness and some have greatness thrust upon them." আমার মগজে হৃদয়ে মজ্জায় ছন্দদোলা ছন্দজিজ্ঞাসা এইভাবে কোনো শক্তি যেন ঢুকিয়ে দিয়েছে একথা বল্‌লে একটুও বাড়িয়ে বলা হবে না। এ-বইটি সেই ধাক্কারই ফল—এ না লিখেই আমার উপায় ছিল না।

বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে এযুগে সব চেয়ে বেশি আলো পেয়েছি আমরা রবীন্দ্রনাথ ও প্রবোধচন্দ্রের আলোচনা থেকে। এঁদের দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি, থুড়ি শ্রুতিভঙ্গি, অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন। কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই এঁদের তর্কসঙ্ঘাতে আমাদের অনেক অস্পষ্ট ধারণার মধ্যে নেমেছে আলো, বাংলা ছন্দের অনেক ব্যাসকূটেরই হ'ল গ্রন্থিমোচন।

কিন্তু এ-দুই অসামান্য ছন্দজ্ঞর বিতণ্ডা সত্ত্বেও একটা কথা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হ'য়েছে। কথাটা শুনতে অদ্ভুত লাগলেও সত্য: সেটা এই যে রবীন্দ্রনাথ ও প্রবোধচন্দ্রের নানামতের মধ্যে অল্প স্বল্প গরমিল থাকলেও এঁদের মূল দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মিলই বেশি—যদিও অক্ষরবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধে কয়েক বৎসর আগেকার নানা তর্কাতর্কিতে চাপা পড়েছিল এই আসল কথাটাই যে এঁরা দু'জনেই বলেছেন যে ছন্দের ভিত্তি ধ্বনিগত ব'লেই শ্রুতিগত। কাজেই বাংলা অক্ষর (সংস্কৃতে "অক্ষর" মানে syllable, কিন্তু বাংলায় এর মানে "হরফ") অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ভিত্তি হ'তে পারে না। এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করব যথাস্থানেই—আপাততঃ রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি দিয়ে প্রমাণ করব যে প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে মূলগত—fundamental—কোনো বিরোধই তাঁর নেই। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন তাঁর ছন্দ পুস্তকে "বাংলা ছন্দের প্রকৃতি" প্রবন্ধে:

"বাংলা ছন্দের তিনটি শাখা। একটি আছে পুঁথিগত কৃত্রিম ভাষাকে অবলম্বন কোরে—সেই ভাষা বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনিরূপকে স্বীকার করে নি। আর একটি সচল বাংলা ভাষাকে নিয়ে—এই ভাষা বাংলার হসন্তধ্বনিকে আপন বলে' গ্রহণ করেছে। আর একটি শাখার উদ্‌গম হয়েছে সংস্কৃত ছন্দকে বাংলায় ভেঙে নিয়ে।"

প্রবোধচন্দ্রও এই কথাই বলেছেন বরাবর যে বাংলা ছন্দের মূল—major—ধারা তিনটি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ আসলে এই তিন ছন্দের মূল প্রকৃতিটি নিয়ে নয়—নামকরণ নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ এদের নামকরণ করেছেন যথাক্রমে—পয়ারজাতীয় ছন্দ, প্রাকৃত বাংলার ছন্দ ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দ: প্রবোধচন্দ্র শুধু প্রথম দুটির নামকরণ করেছেন যৌগিক ছন্দ (অক্ষরবৃত্ত) ও স্বরবৃত্ত ছন্দ। কাজেই তলিয়ে ভেবে দেখলে দেখা যায় যে ছন্দ সম্বন্ধে একটা খুব মূলগত বিষয়ে এঁদের মধ্যে মিল রয়েছে।

বাংলা ছন্দের এই "ত্রিধারার" কথা সত্যেন্দ্রনাথও জানতেন—তাঁর "ছন্দ সরস্বতী" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য—ভারতী ১৩২৫। আধুনিক কবিরাও সবাই তাঁদের কবিতা রচনা করেন এই তিনটি ছন্দের বিধি মেনেই। প্রবোধচন্দ্র তবে কী করেছেন ছন্দোবিধানে? তিনি এই তিনটি ছন্দের জাতিনির্ণয় করেছেন যুগ্মধ্বনির নিকষে।

(কি ভাবে—এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে পাঠক পাঠিকাকে বলে' রাখি যে এ-বিচার একটু বেশি টেকনিকাল হবেই। তবে একটু চেষ্টা করলে সবাই এ ব্যাপারটা সহজেই বুঝতে পারবেন।)

প্রবোধচন্দ্র যা বলেছেন তার সারমর্ম এই:—

যে-ছন্দে যুগ্মধ্বনি (যুগ্ম ও অযুগ্মধ্বনির অর্থ "সংজ্ঞা" অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য) এক unit সময়ের মর্যাদা পায়—(এ unitএর নাম তিনি syllable অর্থে ধরেছেন "স্বর") সে ছন্দের নাম স্বরবৃত্ত ছন্দ। যে ছন্দে যুগ্মধ্বনির ওজন সর্বদাই দু-unit ধরা হয় (এ unit এর নাম মাত্রা) তার নাম মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। যে ছন্দে যুগ্মধ্বনি শব্দপ্রান্তে বসলে সর্বদাই দুই unit, আর শব্দমধ্যে বসলে "সচরাচর" এক unit (এ-unit এর নাম দিয়েছেন তিনি "ব্যষ্টি") সে ছন্দের নাম হ'ল যৌগিক ছন্দ।

প্রবোধচন্দ্রের এই বিভাগ অনবদ্য এবং বাংলা ছন্দবিচারে তাঁর নাম স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে এই জন্যে যে তিনিই সব প্রথম ধরে' দিলেন ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন যে যুগ্মধ্বনির নিকষেই হবে ছন্দের জাতিবিচার, ছন্দের চাবি ওরি হাতে। তাঁর ছন্দব্যুৎপত্তির অন্য অনেক দানও অবশ্যই আছে, কিন্তু সবচেয়ে বড় দান এই যুগ্মধ্বনির পরখে ছন্দের জাতিনির্ণয়।

কিন্তু ভেবে দেখলে মনে হবে যে প্রবোধচন্দ্র একটা জায়গায় মস্ত ভুল করেছেন—এবং তাতেই হয়েছে যতরকম গণ্ডগোল। এখানে ফের বলে' রাখি যে প্রবোধচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এই যে যুগ্মধ্বনির মর্মরহস্য তিনি উদ্‌ঘাটন করেছেন, এবং যে-ভুলটি তিনি করেছেন সেটিও মারাত্মক নয়। তবু এ-ভুলের দরুণ আমাদের ছন্দের অনেক সরল তত্ত্ব অনর্থক জটিল করা হয়েছে যার কোনো দরকারই ছিল না। ব্যাপারটা বলি সংক্ষেপে।

ছন্দের গোড়াকার কথাটা যে ধ্বনিসাম্য এই স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বটি সব আগে মনে গেঁথে নেওয়া চাই। অর্থাৎ কিনা কোনো মূল ধ্বনিকে unit নিয়ে সেই মাপে কাব্যকে সুসংবদ্ধ করলে তবেই তা হবে ছন্দ নইলে নয়। প্রবোধচন্দ্র এই মূল unit ধরেছেন তিন রকম।

কিন্তু ধ্বনির unit ত্রিবিধ হ'তে পারে না ব'লেই এভাবে ছন্দকে বুঝতে গেলে মাপজোপের ব্যাপারটা সরল না হ'য়ে জটিলই হ'য়ে ওঠে। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাই কি বলতে চাইছি। প্রবোধচন্দ্র বলছেন, যেহেতু স্বরবৃত্ত ছন্দের unit স্বর, এবং যেহেতু

শিব্ ঠা কু রের্ | বিঁ য়ে হো লো | তিন্ ক ন্যে | দান

এটি হ'ল চতুঃস্বর স্বরবৃত্ত ছন্দ—কাজেই, তাঁর সংজ্ঞা অনুসারেই, এ ছন্দে প্রতি পর্বে থাকার কথা চারটি করে' স্বর বা syllable (সে যুগ্মই—closed syllable—হোক বা অযুগ্মই—open syllable হোক) কিন্তু এ পংক্তিটির তৃতীয় পর্বে তো চারটি স্বর নেই, আছে মাত্র তিনটি স্বর—দুটি যুগ্ম, একটি অযুগ্ম। এখন এ ছন্দে স্বর (syllable) যদি ধ্বনির unit হয় তাহ'লে তিন্ কন্‌নে-র তিনটি স্বরে ধ্বনিসাম্য হবার কথা নয়—এ সিদ্ধান্ত অকাট্য হ'য়ে ওঠে। কীমাশ্চর্যমতঃপরম? অথচ ধ্বনিসাম্য! হচ্ছে তো—মানে, শ্রুতি একে তো সানন্দেই বরণমালা দিচ্ছে স্বয়ম্বরা হ'য়ে! সবাই জানে ছন্দে শ্রুতি-স্বয়ম্বরার মালার পরে যুক্ত চলে না। কাজেই সিদ্ধান্ত করতে হবে থিওরিতেই ভুল আছে—অর্থাৎ এ ছন্দের unit স্বর বা syllable নয়।

আসলে হচ্ছে কি এ ছন্দে প্রতি পর্বে চারটি ক'রে beat পড়ছে শিব্ = ১, ঠা = ১,

কু=১ রের=১ ...ইত্যাদি—কেবল কন্-শব্দে এসেই জিভ টেনে পড়ল কন্-কে দিল দুটি beat যেমন মাত্রাবৃত্ত ছন্দের যুগ্মধ্বনিকে দেয়। কাজেই এ ছন্দেরও unit মাত্রা ধরলেই সব গোল চুকে যায়। রবীন্দ্রনাথের ক্ষণিকায় "কূলে"-তে :

নাই নাই | নাই গো আ মা র | কি ছু তে কাজ | নাই

এখানে প্রথম পর্বে মাত্র দুটি স্বর (যুগ্ম) আছে কিন্তু প্রত্যেকটিকে টেনে দুমাত্রা ধরা হয় ব'লেই ছন্দরক্ষা হয়। কাজেই সাধ ক'রে এ-স্বরকে unit ধরার ফ্যাসাদ কেনই বা? তেম্নি রবীন্দ্রনাথের গীতবিতানে :

এসো গগন। পারে তোমায়। চাই চাই। চাই—চাই-কে দু-মাত্রা ধরা হ'ল।

তা'ছাড়া বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে ভাবতে গেলেও সময়ের unit—ওরফে মূল ধ্বনি দ্বিবিধ বা ত্রিবিধ ধরলে ঝাপসা ঠেকে। মনে হয় এতে কোথাও কোনো ন্যায়ের ফাঁকি—fallacy—আছেই। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আলোচনা করলে একথা আরো স্পষ্ট হবে। সে কথা এলো ব'লে এখানে আগে একটু বলে' নিই—ধ্বনির unit বলতে কী বুঝছি—এবং এ-unitকে সর্বত্র মাত্রা ধরলে বোঝবার সুবিধা হয় কোন্খানে ও কী জন্যে।

বাংলা ছন্দ যখন পড়ি—কী অনুভব করি সব চেয়ে বেশি করে'? না, অনেকগুলো ধ্বনি কোনো নিয়ম বা রূপকল্প (Pattern) মেনে চলে' একটা নৃত্যগতির আভাষ দিচ্ছে যার গোড়াকার কথা হ'ল একটা কোনো বিধিবদ্ধ পর্যাবৃত্তি (repetition) : "Verse leads us to expect some kind of recurrence"—ইংরাজি ছান্দসিকও বলছেন। সব ভাষার ছন্দেই একথা খাটবে। এ কথাটাকে অন্য ভাষায় ঘুরিয়ে বলা যায়—একটা দোলা আসছে ধ্বনিগুচ্ছগুলি একটা কোনো নিয়মে পর্যাবৃত্ত (repeated) হচ্ছে বলে'। কিন্তু যেভাবেই বলি না কেন আসল কথাটা এই যে (বাংলা ছন্দে) এ-নিয়মের মূলে আছে একটা-না-একটা পুনঃপৌনিকতা—হয় দুই-দুই-এর, নয় তিন-তিন-এর, নয় দুই-তিন-এর, নয় তিন-দুই-দুই-এর ইত্যাদি। এখন, যাকে এক ধরে' করি এই গোনাগুন্তির কাজ তাকে সর্বদাই এক নাম না-দেওয়ার কোনো সার্থকতাই পাওয়া যায় না। তাছাড়া

মেঘের্ উ পর্ | মেঘ ক রে ছে | রঙের্ উ পর | রঙ

মন্দি রেতে | কাঁ সর্ ঘ ন্টা | বাজ ল ঢঙ | ঢঙ

এখানে প্রতিপর্বে চারটি করে' "স্বর" (syllable) আছে ব'লেই ধ্বনিসাম্য হচ্ছে একথা যদি সত্য হ'ত তাহ'লেও নাহয় স্বরকে এ ছন্দের unit ধরার একটা মানে থাকত কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে বাজ্ ল ঢঙ্ পর্বে মাত্র তিনটি "স্বর"—তখন কেন এ বিড়ম্বনা—কেনই বা স্বরকে ডেকে এনে অর্ধচন্দ্র দেওয়া এই বলে' যে "ওহে বাপু এখানে ঢঙ-এ তুমি একেশ্বর হ'য়ে নেই, আছেন 'মাত্রা'—যুগলানন্দে।" বললেই তো হয় সোজাসুজি—"এ ছন্দে প্রতি যুগ্মস্বর

৭৭, বেলতলা রোড, কলিকাতা

সচরাচর এক মাত্রা—তবে কোথাও কোথাও এ-যুগ্মস্বরকে টেনে দুমাত্রা করে' পড়া হয় তাতে ছন্দের বৈচিত্র্য হয় বলে'।"

এটা ত কথার কথা নয়—আর এইটেই যে সত্য। যুগ্মধ্বনিকে বাংলা ছন্দে আমরা কোথাও পড়ি টেনে—যেমন মাত্রাবৃত্তে। কোথাও পড়ি ঠেশে—যেমন স্বরবৃত্তে। কেন? না, এতে করে' ছন্দের নানা গতিভঙ্গি নৃত্যক্ষেপ ফুটে ওঠে বলে'। তাছাড়া ধ্বনির ইউনিট সর্বদাই "মাত্রা" ধরলে ছন্দতত্ত্ব বুঝবারও সুবিধা—যেহেতু ছন্দর সঙ্গে ধ্বনির স্থায়িত্বের আইডিয়াটি রয়েছে আমাদের চিন্তার মজ্জাগত। প্রবোধচন্দ্রের ছন্দোবিভাগ মেনেই দেখাচ্ছি সুবিধাটা কি রকম। স্বর, মাত্রা, ব্যষ্টি এদের গোলমেলে আইডিয়াদেরকে বরখাস্ত করে' যদি শুধু মাত্রাকেই গণ্য করি ধ্বনির unit হিসেবে তাহ'লে তাঁর সূত্রগুলি দাঁড়ায় :

(১) সেই ছন্দের নাম মাত্রাবৃত্ত—যে ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে "সর্বদাই" "বিশ্লিষ্ট" ভঙ্গিতে কিনা টেনে উচ্চারণ করে' ধরা হয় দুমাত্রা।

(২) সেই ছন্দের নাম স্বরবৃত্ত—যে ছন্দে যুগ্মধ্বনি "সচরাচর" "সংশ্লিষ্ট" ভঙ্গিতে কিনা ঠেশে উচ্চারণ করে' ধরা হয় একমাত্রা। কেবল এ ছন্দে অনেক সময়ে ছন্দ ও ধ্বনির বৈচিত্র্য আনতে যুগ্মধ্বনিকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের "বিশ্লিষ্ট" ভঙ্গিতে (টেনে) উচ্চারণ করা হয় দ্বিমাত্রিক ধরে'।

(৩) সেই ছন্দের নাম অক্ষরবৃত্ত যে ছন্দে যুগ্মধ্বনি শব্দের শেষে থাকলে "সর্বদাই" "বিশ্লিষ্ট" ভঙ্গিতে (টেনে) উচ্চারণ করে' ধরা হয় দুমাত্রা, আর শব্দের মধ্যে থাকলে "সচরাচর" "সংশ্লিষ্ট" ভঙ্গিতে (ঠেশে) উচ্চারণ করে' ধরা হয় একমাত্রা। তবে এ ছন্দে অনেক সময়ে শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে উচ্চারণ করে' দুমাত্রাও ধরা হয় ধ্বনি ও ছন্দের বৈচিত্র্য আনতে।

(১) ও (৩)-এর ক্ষেত্রে উচ্চারণভঙ্গির এ দ্বৈকর্তব্যে বিধানে ছন্দশ্রুতি কোন্ কোন্ নিয়ম মেনে চলে' মুক্তির আনন্দ পায় আর কোন্ কোন্ নিয়ম মেনে চললে বৈচিত্র্যহীন বন্ধনের দুঃখই পায় বেশি—এই সব বিচারেরই ভার—কবির, ছন্দজ্ঞের, ছন্দসাধকের। কিন্তু এ-সব নিয়মের ভিৎ হ'ল শ্রুতিনিপুণ ছন্দজ্ঞ কানের রায়। এ-শ্রুতিনিপুণ কান ধ্বনিকে শোনে কী ভাবে? না, সময়ের পটে বিছিয়ে। আর গোণে "সর্বদাই" একটা আঘাত (beat)-এর unit দিয়ে—যার নাম মাত্রা। তাছাড়া মাত্রাকে নাহক্ তিনরকম ধরলে সেটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও হ'তে পারে না—কারণ যে-unit দিয়ে ছন্দ মাপি তার একটিমাত্র নাম থাকাই বিধেয়। এই unitকেই বাংলা ছন্দে তথা সঙ্গীতে আমরা বলি মাত্রা। এ বিষয়ে সঙ্গীতের তালের সঙ্গে কাব্যের ছন্দের একটা গভীর মিল আছে ব'লেই একথা আরো জোর করে' বলবার সাহস পাচ্ছি।

আমি জানি এ বিষয়ে আমার সঙ্গে প্রায় সব কবিই একমত হবেন। রবীন্দ্রনাথ তো বরাবরই মাত্রাকেই ছন্দের ইউনিট ধরে' এসেছেন। ১৩৩৯ সালের জ্যৈষ্ঠের বিচিত্রায় তিনি লিখেছেন তো স্পষ্টই : "আমার মত এই যে মাত্রা নিয়েই ছন্দের স্বরূপ। কিঙ্কিণিতে ঘুণ্টি কিভাবে ও কত সংখ্যায় সাজানো সেকথাটা গৌণ, তার ঝঙ্কারের লয়টাই আসল কথা।" দ্রষ্টব্য—দ্বিজেন্দ্রলালও তাঁর আলেখ্য ভূমিকায় লিখেছেন : "এ-কবিতাগুলির ছন্দ মাত্রিক (syllabic)"। এ থেকে বোঝা যায় যে তিনিও syllable বলতে মাত্রাই বুঝতেন। সত্যেন্দ্রনাথও

লিখেছেন তাঁর ছন্দ সরস্বতী প্রবন্ধে : "মাত্রা-বিচার-শূন্য অক্ষর-গোনা-ছন্দ এখন, উড়ে কবিরা সযত্নে রক্ষা করুন, বাঙালী কবির দ্বারা আর ও-কাজ চলবে না।" এ থেকেও বোঝা যাচ্ছে তিনিও কবিতার মাত্রাবিচারকেই ছন্দের শ্রেষ্ঠ মনে করতেন।

এত কথা বলছি এই জন্যে যে যুগ্মধ্বনিভিত্তি যে-ছন্দোবিভাগ সেটি বৈজ্ঞানিক হ'লেও ধ্বনির unit তিনরকম ধরাটা যে বৈজ্ঞানিক নয় এইটা প্রবোধচন্দ্র ধরতে পারেন নি। পারলে তাঁর ছন্দোবিশ্লেষে এত গণ্ডগোলের অবতারণা হ'ত না—অক্ষরবৃত্ত ছন্দের unit কি ধরবেন সে নিয়েও এত শত মিথ্যে বাগ্বিতণ্ডা ফেঁপে উঠত না। এ বাক্যের ধূলি তর্কের ঝড়ে অনেক ভুগে ও ভেবে তবেই আমি ধরতে পেরেছি তাঁর এই গোড়াকার ভুলটি। তবু তাঁর কাছে বাংলা ছন্দজিজ্ঞাসুরা চিরদিনই ঋণী থাকবেন—ছন্দের অনেক সমস্যারই তিনি নিপুণ ব্যাখ্যা করেছেন বলে'।

আর একটি কথা মাত্র।

অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে প্রবোধচন্দ্র প্রথমদিকে অক্ষরবৃত্ত-ই বলতেন। পরে এর নামকরণ করেন "যৌগিক ছন্দ"। করতে বাধ্য হয়েছিলেন এই জন্যে যে মাত্রা ও স্বরকে ইউনিট ধরে' স্বরবৃত্ত ছন্দকে বুঝতে যেয়ে অনেক নাকানি চোবানি খেয়েও তবু তিনি কোনমতে তীরে উঠেছিলেন এই সাফাইয়ে যে স্বরবৃত্ত ছন্দ মূলত সিলেবিক হ'লেও এর একটা গৌণ মাত্রিক দিক আছে। এ-ব্যাখ্যা কষ্টকল্পিত—কিন্তু এ না করলে চতুঃস্বর স্বরবৃত্তে ত্রিস্বর ও দ্বিস্বর পর্বকে মঞ্জুর করা অসম্ভব। কিন্তু শেষে যখন তিনি অক্ষরবৃত্তকে মাত্রা স্বর অক্ষর কোন-কিছু দিয়েই মেপে পেলেন না তখন ওর unitকে 'ব্যষ্টি' এই ধোঁয়াটে নাম দিয়ে ওর নাম দিলেন 'যৌগিক'—যেহেতু এতে কখনো স্বর unit কখনো মাত্রা unit, অথচ এই ব্যষ্টিটি যে কী পদার্থ তা তিনি বলতে পারলেন না। সেই থেকেই আমি ভাবতে আরম্ভ করি যে তাঁর মূল চিন্তাধারায় কোথাও গণ্ডগোল আছে ও শেষটা বুঝতে পারি এ ভুল হ'ল এই যে ধ্বনির ইউনিট কখনো দুই বা তিনরকম হ'তে পারে না। সালিভান্ সাহেব Limitations of Science বলে একটি বইয়ে লিখছেন যে ether-রূপ বাহনের মধ্যে দিয়ে আলোর ঢেউ আসে এই hypothesisটিকে বাহাল রাখতে বৈজ্ঞানিকরা যখন শেষটায় এত গাণিতিক জটিলতার মধ্যে পড়ে' গেলেন যে শেষটায় etherকে ছেড়ে তবে প্রাণ বাঁচালেন। প্রবোধচন্দ্র ধ্বনির ত্রিবিধ unit এনে এমনি অথই জলে পড়ে' গিয়েছিলেন—এ বিষয়ে একটুও সন্দেহ নেই।

এইজন্যেই অক্ষরবৃত্তের এ উদ্ভট নাম ("যৌগিক ছন্দ" শুনতেও কী খারাপ!) আমি রাখি নি—সাবেকি নামই রেখেছি। বিশেষ যখন এখন আর কোন অসুবিধাই নেই—সব ছন্দেরই ধ্বনির unit মাত্রা হওয়ার দরুণ।

সর্বশেষে প্রণাম আমার ছন্দোগুরু শ্রীঅরবিন্দকে যিনি দিনের পর দিন বহু শ্রম স্বীকার করে' আমাকে শিখিয়েছেন ছন্দের মূলতত্ত্ব—শুধু ইংরাজি accentual এবং quanti ছন্দের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে বহুল ব্যাখ্যা ক'রেই নয়, তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, ছন্দপ্রতিভা ও ঋষিদৃষ্টির নির্দেশে। ছন্দসম্বন্ধে যদি আমার অন্তঃশ্রুতির বিকাশ কিছুও হয়ে থাকে তবে সে তাঁরই আশীর্বাদে ও কল্যাণস্পর্শে।

ভদ্রলোক

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'আপনি কে? আপনাকে তো কই দেখিনি কাল?' সরবতের গ্লাশটা আলগোছে হাত থেকে তুলে নিতে-নিতে কালীপদ জিগগেস করলে।

'কাল? কখন?' শর্বরী তার কালো দুটি চক্ষু বিস্ময়ে অগাধ করে' তুললো।

'কাল রাত্রে।'

'রাত্রে?'

'বা, এ-বাড়িতে এলুমই তো কাল সন্ধের সময়।'

'ও, তা-ও তো ঠিক।' শর্বরী একটু হাসলো, দেখা গেল দূরে কোণের দিকে একটি দাঁতের পিঠে আরেকটি দাঁত বেঁকে বসেছে। শূন্যে-ওড়া পাখির ঝাঁকের মতো দাঁতগুলি মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। শর্বরী বললে, 'কেন, আপনি যখন আসেন তখন সবাইর সঙ্গে আমিও উপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখেছি।'

'তখন তো মাথার মুকুটটার জন্যে ঘাড়-ফেরানোই এক বিড়ম্বনা, দেখব কি করে'? তথনকার কথা বলছি না,' কালীপদ সরবতে চুমুক দিল : 'পরে, বিয়ের পর, বাসর-ঘরে কত রাজ্যের মেয়ে ছিলো, আপনি ছিলেন কোথায়?'

'আমি যে ছিলুম না তা আপনাকে বললে কে?'

'যদি ক্ষমা করেন তো বলি, আপনার চোখ।' কালীপদ গ্লাশের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে বললে।

'দেখলো না আপনার চোখ, আর দোষ হলো আমার?' শর্বরী হাসলো, কিন্তু সেই দাঁত পর্যন্ত নয়।

'তার মানে, আপনি ছিলেন? ককখনো ছিলেন না। আমি বাজি ধরতে পারি।'

'কী দেবেন, যদি প্রমাণ করতে পারি যে আমি ছিলুম?'

কালীপদ কোনোদিকে না তাকিয়ে বলে' ফেললো : 'সব দেব। যা আপনি চান।'

'প্রণতিকে ছেড়ে দেবেন?'

'প্রথম দিনেই অতটা উদার হতে বলবেন না। এখনো ফুলশয্যাই হয়নি। ও ছাড়া আর যা-কিছু।

'দরকার নেই কোন-কিছুতে। আমি ছিলুম না।' বলেই শর্বরী চলে' যাচ্ছিলো।

'শুনুন।' কালীপদ ডাকলো : 'ছিলেন না কেন?'

শর্বরী ঘুরে দাঁড়ালো। বললে, 'ছিলুম না আবিষ্কার করতে পারেন, কেন ছিলুম না সেটাও উদ্ভাবন করুন।'

'বলবো?' কালীপদ ভয় দেখাবার মতো করে' বললে।

'বলুন।' শর্বরীর বলাতে তীব্র উপেক্ষা।

'আচ্ছা বলুন তো, কী বলবো?'

'কী আর বলবেন! বড়-জোর বলবেন, অসুখ করেছিলো।'

'কখনো না।'

'না হলে হয়তো বলবেন, ঘুম পেয়েছিলো, ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।'

'অসম্ভব।'

'তবে কী বলবেন আপনিই বলুন।' শর্বরীর চোখের পালকগুলি কাঁপছে।

'বলবো, এই বিয়ে-ব্যাপারটাই মানে এই হৈ-চৈ হল্লা-হুল্লোড়, আপনার কাছে ভীষণ বীভৎস লাগছিলো। আপনি একা-একা ছাদের অন্ধকারে চুপটি করে' বসে' ছিলেন।'

'আপনার মাথা!' শর্বরী আরেকটা ঘাই দিলো।

'দাঁড়ান, গ্লাশটা নিয়ে যান।' গ্লাশটা হস্তান্তরিত করতে-করতে কালীপদ বললে, 'কালকের আর সবাই তো বাড়ি চলে' গেছে, আপনি গেলেন না?'

'আমি যে চিরকালের।'

গ্লাশটা ছেড়ে না দিয়ে কালীপদ বললে, 'তার মানে?'

'যে মূর্খ তার কাছেই মানেটা খুব গভীর হয়ে ওঠে।' শর্বরী গ্লাশটা ছাড়িয়ে নিল: 'মানে, আমাকে আপনি আমারই বাড়ি ছেড়ে চলে' যেতে বলেন?'

'আপনার বাড়ি!'

'যে-বাড়িতে আপনি থাকেন সে-বাড়ি যদি আপনার বাড়ি হয়, এ-বাড়িও আমার।'

'আপনি এ-বাড়িতে থাকেন নাকি? যখন আমি এ-বাড়িতে প্রণতিকে দেখতে এসেছিলুম, আপনি ছিলেন?'

'ছিলুম বই কি। যাবো কোথায়?' শর্বরী হাসতে-হাসতে বললে।

'বা, আপনাকে তো কই সেদিন দেখি নি।'

'এলেন দেখতে প্রণতিকে, আমাকে দেখবেন কী করে' শুনি?

'তবু তো দেখা হতে পারতো। তার আগেও তো পারতো।'

'বেশ তো, তার পরেই না-হয় হয়েছে।'

'আচ্ছা, আপনি তো এ-বাড়িতে থাকেন, আপনি কী হন প্রণতির?'

'যা হই, তাতে আপনার কান মলে' দিতে পারি।' বলে' শর্বরী দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জীবনে এই প্রথম ও এই দীর্ঘতম আলাপ। কালীপদর বাসি-বিয়ের দুপুরে।

আশ্চর্য, কোথায় ছিল এ এতদিন? বলে কিনা, এ বাড়িতেই ছিল। যখন প্রণতিকে দেখতে এসেছিলো সে, তখনো ছিল! সেদিন সে এসে কেন এ-কথা বলেনি, তোমাদের

বাড়িতে আর কে-কে মেয়ে আছে নিয়ে এস? বলতে পারতো সে অনায়াসে, তার চাকরিটাই ছিল এত দাম্ভিক এত প্রগল্‌ভ। তাকে জামাই পেতে মধ্যবিত্ত মেয়ের বাপেদের মধ্যে কম কাড়াকাড়ি হয় নি। একশো চুরাশিটি সে মেয়ে দেখেছে, এবং কোনো-কোনো বাড়িতে, একসঙ্গে না হলেও, ক্রমান্বয়ে, সব কটি বিবাহোন্মুখীই। শুধু প্রণতিদের বাড়িতে এসেই সে কিনা খোঁজ নিলে না আরো কোনো মেয়ে আছে কিনা। ভোগের শেষ না থাকলেও স্বাস্থ্যের শেষ আছে, তেমনি সন্ধানের শেষ না থাকলেও আছে শ্রান্তির শেষ। তাই কালীপদকেও এক সময়ে থামতে হলো, এবং সেটা, এর না হয়ে ওর, বিনতি না হয়ে প্রণতির ঘরের দুয়ারে। তখন কে জানতো তারই পাশের ঘরে—শর্বরী, শর্বরীর মতো মেয়ে রয়েছে বসে', বয়সে গা ঢাকা দিয়ে। শর্বরী! নামটা শুনলেই যেন মনে হয় ঠিক এই শর্বরী—যার চোখ দুটো আয়ত আর অগাধ আর যার শরীর শুধু শরীর নয়, একটা দ্যুতিমান উপস্থিতি! সত্যিকারের যে সেটা কী, কালীপদ বুঝতে পারে না।

অবিশ্যি স্ত্রী-হিসেবে পছন্দ করবার মতো মেয়ে এই প্রণতি। অনেক-অনেক কালো আর ফর্সা, বেঁটে আর ঢ্যাঙা, মোটা আর লিকলিকে মেয়ের মধ্যে প্রণতি চোখে-পড়ার মতো মেয়ে। সেই স্ত্রীই সফল স্ত্রী যাকে অপ্রতিবাদে বাইরে বার করা যায়, প্রণতির চেহারার সেই শালীনতাটাই কালীপদকে আকৃষ্ট করেছিলো। বেশ একটা সম্ভ্রান্ত গাম্ভীর্য ছিল তার চেহারায়। সে ততটুকু মাংসল যার বেশি হলে সে মোটা হয়ে পড়তো, ততটুকু দৃঢ় যার বেশি হলে তার মেয়েলিত্ব থাকতো না। তার উপর গায়ের রঙ তার বাঙালি অভিধানে রীতিমতো ফর্সা। ফর্সার জন্যে কালীপদর নিজের কোনো মোহ ছিল না, প্রয়োজন ছিল অজাতা দুহিতার জন্যে, কেননা কালীপদ নিজে নিষ্প্রতিবাদ কালো। তার উপর প্রণতি বি-এ পাশ। অবিশ্যি কালীপদ তত মূর্খ নয় যে বি-এ পাশ মেয়ে শুনে মনে একটা মূর্ছার ভাব আনবে, কেননা একদা যে মেয়ে সর্বদাই সে মেয়ে; তবে ইংরিজিতে একটু মক্সো থাকলে ক্লাবে-ডিনারে একেবারে ঠেকতে না হয়, এইটুকুই যা সুবিধে। তার উপরে তার বাবা কালীপদকে জল খেতে পাঁচ হাজার টাকা পণ দিয়েছেন আর মেয়ের নামে লাইফ-ইন্‌সিয়োর করিয়ে দিয়েছেন, বেশি নয়, বিশ হাজার। আর, তারো উপরে, কোলকাতায় একখানা বাড়ি দিয়েছেন। বিয়ে করে' কিছু লাভ করতে না পারলে সভ্য সমাজে মুখ দেখানো যায় না, লোকে বলে, গাড়োল! অবিশ্যি তেমন কিছু সে জিততে পারে নি, তার চেয়েও কম-মাইনের পাত্র তার চেয়ে দশগুণ বেশি পেয়েছে। তাই বন্ধু বান্ধবরা যখন লোকসান খতাতে বসতো, কালীপদ আর-কিছু না পেয়ে হাসিমুখে বলতো: 'কী করবো ভাই, মেয়েটিকেই ভারি মনে ধরেছে।' বলা বৃথা, এর উপর আর কোনো কথা চলতো না।

মনে ধরেছে! কিন্তু সেদিন, কিম্বা আর কোনো দিন, মানে তার চাকরি পাবার পরে, যদি প্রণতির বদলে শর্বরীকে সে দেখতো, তবে কী করতো সে? কিছুই ভনিতা করতো না, সোজা তার

মার কাছে গিয়ে বলতো: 'আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।' শর্বরীর বিধবা মা, মৃণালিনী, আতঙ্কিত বিস্ময়ে সাদা হয়ে যেতেন। কালীপদকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে' বলতেন: 'তুমি?' কালীপদ বলতো: 'হ্যাঁ, আমি। আমি ছাড়া শর্বরীকে লাভ করবার পুরুষ ঈশ্বর আর সৃষ্টি করেন নি।' মৃণালিনীর তবু ঘোর কাটতো না। বলতেন: 'কিন্তু মেয়ে তো আমার সুন্দর নয়।' কালীপদ হাসতো। বলতো: 'কিন্তু সুন্দর তো আমার চোখ, সুন্দর তো আমার বাসনা।' মৃণালিনী তারপর দীর্ঘশ্বাস মোচন করে' বলতেন: 'কিন্তু বাবা, তোমাকে দেব-থোব এমন আমার সামর্থ্য কোথায়? ওকে কোলে করে' বিধবা হয়েছি, পড়ে' আছি বৈমাত্রেয় বোনের সংসারে—মেয়ের বিয়ের জন্যে একটি পয়সাও তো উনি রেখে যেতে পারেন নি।' এর উত্তরে কী বলতো কালীপদ, বিষয়ী, ব্যবসায়ী কালীপদ? বলতো: এক জোড়া শাঁখা বা একখানি লাল-পাড় সাড়িও নয়, মা, শর্বরী যেমনি আছে তেমনি আমাকে দিয়ে দিন। আপনারা যাঁরা দেবেন, সমস্যা তাঁদের নয়, কী দিচ্ছেন; সমস্যা আমার যে নিচ্ছি, কোথায় কোনখানে তাকে রাখবো?'

অনায়াসে হতে পারতো। কোথাও এতটুকু আঁচড় পড়তো না। জাতে মিলতো গোত্রে মিলতো বয়সে মিলতো, সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার এতটুকু বিচ্যুতি হতো না। এক সপ্তাহ আগে হলেও হতে পারতো। চিরজীবনের মতো হতে পারতো। তা হলে এই ফুলশয্যার রাতে প্রণতির বদলে পার্শ্বলীন হয়ে থাকতো সে—কথাটা মনে হ'তেই যেন কালীপদর গভীরতম আত্মা নিঃশব্দতম আর্তিতে কেঁদে উঠলো। সম্ভ্রান্ত গাম্ভীর্যের বদলে থাকতো তখন একটি দ্যুতিমান উপস্থিতি, আর বিকশিত হাসির দূর অন্তরালে থাকতো একটি তখন অসম্ভিবদ্ধ উদ্ধত দাঁতের রোমাঞ্চময় তীক্ষ্ণতা। মা হতে পারতো তা হয় না কেন?

এ-কথা ভেবেছিলো কালীপদ ফুলশয্যার রাত্রে, এবং এ-কথা সে এই দশ বৎসর সমানে ভেবে আসছে। যা একবার হয় না তা কি কোনকালেই হয় না?

প্রথম-প্রথম ছুটি হলেই, তা সে দু' দিনেরই ছুটি হোক না কেন, কালীপদ স্ত্রীকে নিয়ে কোলকাতা আসতো; আর, বলে' দিতে হবে না, উঠতো এসে শ্বশুরালয়ে। প্রণতির আনন্দের অবধি থাকতো না অকাতরে টাকা খরচ করে' দূর দেশ থেকে এমনি ঘন-ঘন বাপের বাড়ি আসতে পাচ্ছে সে; আর বিয়ের পর, কে না জানে, সব মেয়েই তার স্বপ্ন আর ঐশ্বর্য, স্বামীর উপর প্রতিপত্তি ও স্বামীর অর্থের উপর স্বাধীনতার ভাবটা বাপের বাড়ির মহলে জাহির করবার জন্যে প্রচণ্ড ব্যস্ত হয়ে ওঠে! সে-জাহির করবার সুযোগ যে যত পায় তারই তত সার্থক বিবাহ। তাই বারে-বারে এ সুযোগ পায় বলে' বারে-বারেই সে কোলকাতার জন্যে উদগ্রীব। কিন্তু কালীপদ যায় কেন? যায় তো তার বোনের বাড়ি ছেড়ে তার পিসতুতো দাদার বাড়ি ছেড়ে প্রত্যেক বারেই শ্বশুর-বাড়িতে ওঠে কেন? সেখানে তার আছে কে? কিন্তু এ-কথার উত্তর সে কাকে দেবে? অন্তর্যামীকে?

কিন্তু, আশ্চর্য, সামাজিক সমীচীনতায় যতটুকু কাছে পাওয়া যেতে পারে, ততটুকু

কাছেও শর্বরীকে কালীপদ পায় না। কেমন যেন তাকে এড়িয়ে চলে শর্বরী। কেমন যেন সে স্নান ছন্দে দূরে-দূরে ঘুরে-ঘুরে শরৎ যায়। ডেকে একটা কিছু জিগগেস করলে শুকনো মুখে একটু হাসে কি না হাসে, এক-আধটা কথা বলে কি না বলে, চোখের দিকে একটু তাকায় কি না তাকায়! এখানে আসে-ই কালীপদ শর্বরীকে, তার দৈনন্দিন স্বাভাবিকতায় একটু-বা সহজ একটু-বা শিথিল ভাবে দেখবার জন্যে, এই ধরো, কখন সে মুখ ধোয়, কখন সে তেল মাখে, কখন সে স্নান করে, কেমন করে' সে খায়, কী সাজে সে কলেজে যায়, কখন সে চুল বাঁধে ও কতক্ষণে সে ঘুমোয়! কিন্তু সন্ধিৎসু চক্ষুকে সতর্ক চক্ষু যে কী করে' ফাঁকি দেয় কালীপদ তা ধরতে পারে না। তবু প্রণতির কাছে সে এসে বসে, যখন প্রণতি দ্রুত নিশ্বাস ও দ্রুত পক্ষ-সঞ্চালনের সঙ্গে তার মোটর-চালনার বর্ণনা দিচ্ছে, মা-মাসির মতো উৎসাহিত না হলেও দু'-চারটে সে কৌতূহলী প্রশ্ন করে। কিন্তু কালীপদ যখন তার বাঘ-শিকারের গল্প করে, সে-গল্প মোটর-চালানোর চেয়ে কত বেশি রোমাঞ্চকর, শর্বরী ধার দিয়েও ঘেঁষে না। ব্রে-খেলার জন্যে চতুর্থতমের দরকার—কালীপদ আছে, প্রণতির দুই সহোদর মদন আর বদন আছে, শূন্যতা নিরাকরণের জন্যে ডাক পড়ে শর্বরীর। পড়ার টেবিল থেকে জবাব আসে: নতি-দিকে বল্, আমি পারবো না। সবাইকে নিয়ে কালীপদ ঘুরে বেড়ায় জু থেকে দক্ষিণেশ্বর, রাজগঞ্জ থেকে ডায়মণ্ডহারবার—যত সব অভিজাত, মফস্বলিপনা—তবু যার জন্যে এত দৌড়-ঝাঁপ সে-ই থাকে না সঙ্গে; হয় বলে, মাথা ধরেছে, নয় বলে, সময় নেই। কিন্তু কেন এত বিরাগ? আর কিছুই নয়, হিংসে। এক পরিবারে এককালীন দুই কুমারী মেয়ের মধ্যে একজনের বিয়ে হয়ে গেলে স্বভাবতই আরেকজনের হিংসে হয়, বিশেষত প্রথমোক্ত যদি হয় ধনী, আর সেটা নিজের দরুণ নয়, আকস্মিক-পরিচিত তৃতীয় ব্যক্তির দরুণ। ছিল সমান-সমান, একই অন্ধ বন্দীশালায়, হঠাৎ দাঁড় ছেড়ে কিনা সে ডালে গিয়ে বসলো, ছোলা-ছাতু ছেড়ে খাওয়া ধরলো কিনা ফল-পাকড়, আর শিকে পাখা না ঝাপ্‌টে উড়াল দিলো কিনা সে নীল আকাশ থেকে লাল আকাশে। এ-হিংসেটা আসে বর্তমান দুঃখের থেকে, অবদমিত কল্পনার থেকে। যে-হেতু আমার হলো না সে-হেতু ওরটা অসহ্য—এই ক্ষুদ্র চিত্তবৃত্তি থেকে। তাই এটা ঔদাসীন্য নয়, এটা জ্বালা। আর, যাকে সব চেয়ে শীতল রাখতে চাই সে যদি বুঝি জ্বলছে, তবে তার জ্বালাটাই বাড়িয়ে দেবার জন্যে মনে একরকম একটা নিষ্ঠুরতা জন্মায়। সেই নিষ্ঠুরতার নামই ভালোবাসা।

তাই ইদানি যখন কালীপদ আসতো, কাউকে সঙ্গে ডাকতো না, শর্বরীকে তো নয়ই। শুধু প্রণতিকে নিয়ে বাইরে বেরুতো, এমন ভাব যেন প্রণতি ছাড়া কেউ তার সঙ্গে পথে চলবারো যোগ্য নয়। জিনিসে-পত্রে, অলঙ্কারে-আভরণে, স্তুতিতে-ব্যাখ্যানে এই কথাই সে চড়া গলায় প্রচার করতে চাইতো, প্রণতিকে সে কত ভালোবাসে, প্রণতি কেমন মনের মত স্ত্রী, প্রণতির সুখ কত চারদিকে। সাদা লংক্লথের অর্ধ-স্নান ব্লাউজের উপরে আটপৌরে শাড়ির কুণ্ঠিত আঁচল টেনে শর্বরী দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়াতো, সবাইর পিছনে, আজ কী-কী

প্রণতি কিনে এনেছে। তাকে কী-রকম যেন দুঃখী দেখাতো। কারু হাসির কথায় সবাইর সঙ্গে সেও যদি হাসতো তার হাসিতে শব্দ ফুটতো না, হাসির সঙ্গে কী-রকম একটা নিশ্বাস আসতো বেরিয়ে। ইদানি তার শরীরটা কী-রকম ভাঙা-ভাঙা দেখাতো, মুখ রোগাটে হয়ে এসেছে বলেই হয়তো চোখের দৃষ্টি আরো স্থির ও আরো গভীর বলে' মনে হয়, এবং শরীরের যত স্বপ্ন সব যেন মুছে গেছে তার এই বেশ-বাসের দীনতায়। নিরাশার ধূসর প্রতিচ্ছবি।

দুঃখী! কিন্তু কে বলেছিলো তাকে দুঃখী হতে? যখন প্রথম এ-বাড়িতে পা দিয়ে কালীপদ ডাক দিয়েছিলো: কোথায় তুমি, তখন সে পাশের ঘর থেকে কেন সাড়া দিয়ে ওঠেনি: এই যে, এখানে? এত ভিড়ের মধ্য দিয়ে কালীপদ চলেছে, কেন সে কোনোদিন হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরেনি? হাটে-মাঠে এত লোক এল-গেল, সে ছিলো কোথায়?

বেশ তো, আজ, এইখানেই তো সে আছে—কালীপদর নির্ভুল নাগালের মধ্যে।

কালীপদর মধ্যে একটা দৈত্যকায় দুর্নিবার ইচ্ছা হঠাৎ জন্মলাভ করলো, বিশাল অজগরের মতো। ভুল কী—এই তো সামনেই শর্বরী দাঁড়িয়ে আছে, দুর্বল, আক্রান্ত-উৎসুক, পলায়ন-পিপাসিত। কালীপদর ইচ্ছা হোল, হিংস্র শ্বাপদ-ইচ্ছা, মুহূর্তে শর্বরীকে সে নিজের কাছে আকর্ষণ করে' নেয়, বলে, 'দেখুক ও ওর গয়না আর শাড়ির রূপচ্ছটা, তুচ্ছ যত সব দৈহিক উপকরণ, তুমি চলো আমার সঙ্গে শর্বরী, এই রক্তিম রাত্রে, পৃথিবী ছাড়িয়ে, এর চেয়ে অনেক বড়ো জিনিস তোমাকে আমি দেব।' ইচ্ছা হলো বলে, কিন্তু বলে নি; হাত বাড়িয়ে দেয়া দূরের কথা, এক ইঞ্চিও সে টলেনি, একটা নিশ্বাসও সে বেশি ফেলেনি। নিজেকে সে নিজের জায়গায় ফিরিয়ে এনেছে। সে ভদ্রলোক, অশোভন সে একটা কিছু করে' ফেলতে পারে না। তার হাতে একটা দায়িত্বপূর্ণ চাকরি, শৃঙ্খলার প্রতি নিষ্ঠাটা তার প্রধান পালনীয়। তার উপর সে একটা সামাজিক সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট, সে একজনের স্বামী, অতি-সহজ কাজটাও সে অতি-সহজে করে' ফেলতে পারেনা। তাই সেই তন্তুমাত্র ব্যবধান থেকে সে ফিরে এসেছে। যে পারেনা ফিরতে, তাকেই আমরা চোর বলি, খুনে বলি, আরো কত-কি বলি।

একদিন শর্বরীর সামনেই মাসিমা, মানে মৃণালিনী, বললেন কালীপদকে: 'এত জায়গায় ঘোরো, শর্বরীর জন্যে একটি পাত্র জোগাড় করে' দিতে পারো না?'

'শর্বরী বললেই পারি।'

অন্যান্য কথায় তো সে পাশ কাটিয়ে ছুটে পালায়, আজ হয়তো বিয়ের কথা শুনেই সে থেমে পড়েছে।

উত্তরটাকে মৃণালিনী শ্যালিকা-সম্পর্কিত রসিকতা মনে করলেন। বললেন, 'আছে নাকি তোমার জানাশোনা?'

নির্বিবাদে কালীপদ বললে, 'আছে একটি।'

'বলো কী? কার ছেলে? দেশ কোথায়?'

'সে তো যে-কোনো মুহূর্তেই জেনে নেয়া যায়।'

'করে কী? চাকরি করে?'

'চাকরি না করে' আজকাল কোনো ছেলে বিয়ে করতে অগ্রসর হয় নাকি?'

'কী চাকরি? মাইনে কতো?'

'তা সাত-আটশো হবে।'

'তোমাদের ডিপার্টমেণ্টে?'

'হ্যাঁ।'

'স্বভাব-চরিত্র?'

'চমৎকার। সদালাপী, মিতাহারী, জিতেন্দ্রিয়।'

মৃণালিনী আনন্দে আই-ঢাই করে' উঠলেন। বললেন, 'প্রকাণ্ড একটা কিছু হাঁকবে বুঝি?'

'এক পয়সাও নয়।'

'বলো কী? আশ্চর্য!' সংসারে আশ্চর্য যে আরো অনেক আছে তাই স্মরণ করে' মৃণালিনী বললেন, 'কিন্তু শর্বরীকে কি পছন্দ হবে?'

'সেইটেই সমস্যা।' কালীপদ গম্ভীরমুখে বললে।

'মেয়ে আমার একটু কালো—ঐ যা খুঁৎ—নইলে—'

বাধা দিয়ে কালীপদ বললে, 'তা ছেলেরো একটা খুঁৎ আছে।'

'কী?'

'ছেলেটি দোজবরে।'

মৃণালিনীর মুখ কিঞ্চিৎ বিরস হয়ে গেল। বললেন, 'বয়েস কত?'

'বেশি নয়। আমাদের বয়সী। আটাশ-উনত্রিশ।'

'ছেলেপুলে আছে নাকি?'

'নেই।'

'বিয়ে হয়েছে কদ্দিন?'

'বছরখানেক।'

মৃণালিনীর মুখ আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। বললেন, 'দিদিকে বলি গে এ-কথা।'

'কিন্তু তার আগে মেয়ের মত নিন। শর্বরী যে-ভাবে ছুটে পালালো তাতে সে দোজবরে ককখনো বিয়ে বসবে না।'

এ-ভাবে যদি সে তার হৃদয়কে উদ্ঘাটিত করতে চেয়ে থাকে তবে কালীপদ ভয়ানক ভুল করেছে। খুব গভীর কথা খুব খেলো করে' বলা যায় বটে কিন্তু মেয়েরা তা বুঝতে পারে না। শর্বরী যদি বুঝেও থাকে, বুঝেছে যে কালীপদ তার শ্যালিকা-সম্পর্ক নিয়ে একটা গ্রাম্য রসিকতা করছে!

অবিশ্যি সে-সম্বন্ধটা ফলবান হয়নি। কোনো সম্বন্ধই ফলে এটা কালীপদর ইচ্ছা নয়।

তার ইচ্ছা, অদ্ভুত ইচ্ছা, শর্বরী চিরকুমারী থাকে, তার বিয়ে কোনোদিন না হয়, কারু সঙ্গেই না হয়। এ-দিকে, সম্বন্ধের একটা খোঁজ পেলে সে সম্ভবেরও অতিরিক্ত তদবির-তালাস করে, ট্রেনভাড়া করে' নিজে যায়, পাত্রীর প্রশংসা করে' দিস্তে-দিস্তে চিঠি লেখে। তার ব্যবহার দেখে কেউ সন্দেহ করতেই পারেনা মনে তার কী আছে। মনে যা আছে ব্যবহারে তা ফোটাতে গেলেই তো একটা গোলমাল! যে ভদ্র সে ভদ্রতার অনুপাতেই ব্যবহার করবে। আর যেখানে ব্যবহার নেই আছে কল্পনা সেখানে সে ভাবুক, আমি যখন যেতে পারিনি চাঁদে, কেউ যেন সেখানে না যায়, চাঁদ জেগে থাক একটা মৃত, শীতল, শুভ্র তুষারপিণ্ড হয়ে।

আর-কিছু না পেয়ে শেষকালে একটা চিঠি লিখলে কালীপদ। চিঠি লিখবারো একটা ভদ্র ওজুহাত দরকার, তাই সে বিজয়া-দশমী পর্যন্ত অপেক্ষা করলে। ভেবেছিলো মুখে যা স্পষ্ট না বলা যায় তা বোধ হয় লেখা যায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, ইনিয়ে-বিনিয়ে; কিন্তু লিখতে বসে দেখলো মুখের ভাষার চেয়েও লেখার ভাষা ঢের বেশি সভ্য আর ভদ্র আর দুর্বোধ। তাতে আর কিছুই বলা যায় না, বলা যায় বাঙলা আমি কিছুই লিখতে পারি না। সুতরাং চিঠি শেষ করে প্রণতিকে সে ডাকলে এতে আর-কিছু সে সংযুক্ত করে' দেবে কিনা। শুষ্ক, স্বচ্ছ চিঠি—প্রণতি অনায়াসে দু'লাইন যোগ করে' দিল।

সে-চিঠির উত্তর একটা এসেছিলো মনে পড়ে। এসেছিলো প্রণতির নামে, আর তাতেই কালীপদর চিঠির প্রাপ্তি-সংবাদ ছিল, আর ছিল মেরুদণ্ডহীন মামুলি প্রণাম। কিছুদিন পরে সে-চিঠিটাকে বাড়ির আবর্জ্জনা-কুণ্ডে পড়ে' থাকতে দেখে তবে কালীপদ শান্ত হলো।

পরে কবে আবার কোলকাতা যাওয়া যায় কালীপদ ক্যালেণ্ডার খুঁজছিলো। এর পরেই দোল, কিন্তু হা অদৃষ্ট, ছুটি মোটে একদিন—তা-ও রবিবার। দোল! হোক এক দিন—একদিনের ছুটিতেই সে যাবে।

কিছুকাল আগেও সে এত ভদ্র ছিল না। এই দোলের দিনে, সমস্ত বিবর্ণ বৎসরের মধ্যে রক্তিম এই একটিমাত্র দিনে, সে আর তার বন্ধুরা কী হুল্লোড়ই না করেছে, রাস্তায় বাড়িতে ট্যাক্সিতে ট্রামে! ভদ্রলোকেরা ভেবেছে উন্মাদ, ছন্নছাড়া। রঙ, আবির, কালি, আলকাৎরা—কোনোটারই অভাব ছিলো না। চেনা, মুখ-চেনা, অন্যের মধ্য দিয়ে চেনা, কত পুরুষের সঙ্গে-সে দোল খেলেছে, রঙ নিয়ে হুলুস্থুল করেছে। তেমনি আত্মীয়, আত্মীয়ের আত্মীয় ও হতে-পারতো-আত্মীয় কত মেয়েকেও সে রঙ দিয়েছে, এবং তারাও তাকে ছেড়ে কথা কয়নি। সেই সব দিন! সকালে বেরিয়ে বিকেল তিনটের সময় ফিরেছে হস্টেলে—আর এতটা সময় সে একটা কী চমৎকার শৃঙ্খলাহীনতা!

কালীপদ চঞ্চল হয়ে উঠলো। বললে, 'আমি যাবো।'

একেকবার যাওয়া-আসাতে কী ভয়ানক খরচ হয় তা স্মরণ করে' প্রণতি প্রতিবাদ করলো। বললে, 'না, একদিনের ছুটিতে যাবো না।'

'এক মুহূর্তের ছুটি হলেও যাবো। আমার কাজ আছে।'

'কী কাজ?'

'দোল খেলবো।'

সে আবার কী কাজ—প্রণতি ঘাবড়ে গেল। বললে, 'দোল খেলবে, এখানে খেল' না।'

'এখানে?' কালীপদ হাসলোও না, কাঁদলোও না, খালি বললে, 'এখানে নয়, কোলকাতায়।'

'কোলকাতায়? রাত জেগে বারো ঘণ্টা জার্নি করে'? কেন সেখানে তোমার আছে কে?' স্ত্রীত্বে ক্রমশই উন্নীত হচ্ছে প্রণতি।

'সেখানে কে আছে?' কালীপদ একটাও ঢোঁক গিললো কিনা বোঝা গেল না: 'কে আবার থাকবে? পুরোনো বন্ধুরা আছে, তুমি আছ—দোল খেলতে আবার লোক লাগে নাকি?'

'আমি নেই। আমি যাবো না কোলকাতায়।' কণ্ঠে ও আভরণে প্রণতি একসঙ্গে ঝঙ্কার দিল।

দিক, তবু গেল কালীপদ। পরে যে-সব যুক্তি দেখালো তার মধ্যে এও একটা ছিল যে আবিরে স্বাস্থ্য ভাল হয়—তবে সে-আবির এখানে কেন পাওয়া যায় না এ-কথা আর প্রণতি জিজ্ঞাসা করলে না।

উঠলো এসে হোটেলে, সকালবেলা। এবং সাজগোজ সমাপন করে' নটার সময় রাস্তায় নামলো। তার বেশবাস দেখে সন্দেহ হয় না, তার দুই পকেটে আবির, লাল আর বেগুনি, পাউডার আর এসেন্স—সে রঙ খেলতে বেরিয়েছে। চলেছে যেন শ্বশুর-বাড়ি, এমন চেহারা,—জরিপাড় কোঁচানো তাঁতের ধুতি, গায়ে গরদের পাঞ্জাবি, পেটেণ্ট-লেদারের পাম্প পায়ে। ভয় পেয়ে তাকে সবাই রাস্তা ছেড়ে দেয়—সেই অত্যুগ্র পরিচ্ছন্নতার হানি করতে কারু সাহস হয় না। কিন্তু সত্যিই সে আজ রঙ খেলতে বেরিয়েছে—সেই সব ষ্ট্র্যাপ-খসা স্যাণ্ডেল পায়ে, কৃপণ হাপ-সার্ট গায়ে, ফেরতা-দিয়ে-পরা কাপড়ের ছেঁড়া লুকিয়ে দীনমনাদের মতো নয়, সে বেরিয়েছে বিলাসে, অপচয়ে, উৎসবে। ছোট একটা ছেলে তার চেয়ে বড়ো একটা বাঁশের পিচকিরি হাতে করে' কালীপদর পিছে-পিছে আসছিলো—কালীপদ তাকে বললে, 'ভয় কী? রঙ দেবে? দাও।' বড়ো একজন কে বললে, 'আপনার দামি-দামি জামা-কাপড় সব নষ্ট হয়ে যাবে না?' কালীপদ নিজের দিকে চেয়ে একটু হাসলো। বললো: 'নষ্ট? তা কী করা যাবে বলো? কারু জামা-কাপড় নষ্ট হবে বলে' তো রঙের খেলা বন্ধ হতে পারে না! নষ্ট হবে তো, দামি-দামি জামা-কাপড় সে পরে কেন আজ?'

আর যায় কোথা! মুহূর্তে কালীপদ রঙের চেয়ে জলে বেশি ভিজে গেল। আর যখন একবার আঁচড় পড়েছে তখন আর তার রক্ষে নেই—সে তখন দাগী, সে তখন চিহ্নিত।

দল ভেঙে সে যখন শ্বশুর-বাড়ি এসে পৌঁছুলো তখন এগারোটা। নিচেই দুই শাশুড়ির সঙ্গে দেখা—তাঁরা তো একেবারে আকাশ-স্খলিত! জামাই, এত বড়ো জামাই, ছেলেমানুষের মেতো ভূত সেজে রঙ খেলতে এসেছে এটা অভাবনীয়ের চেয়েও বেশি। সমস্বরে প্রশ্ন হলো:

'প্রণতি আসে নি?' আবির দিয়ে শাশুড়িদ্বয়কে প্রণাম করতে-করতে কালীপদ বললে, 'না। আমারো আসবার কোনো ঠিক ছিল না, আপিসের একটা জরুরি কাজে আমাকে রোববারই চলে' আসতে হয়েছে, সন্ধের ট্রেনেই আবার ফিরে যাবো। কিন্তু এরা—এরা সব গেল কোথায়—মদন, বদন, বাসন্তী?' সব ওরা নিজের পাড়া সমাধা করে' আরেক পাড়ায় গেছে—এখনো ফেরে নি। 'আর শর্বরী?' সে এইমাত্র স্নান করে' গিয়ে উপরে চুল আঁচড়াচ্ছে।

যত দ্রুত কালীপদ উপরে উঠে গেল ততটা দ্রুততার সঙ্গেই শর্বরী রইলো বারান্দায় বসে', ভিজা খোলা চুলে উঠে দাঁড়াতে হয়, দাঁড়ালো। হাসতে হয়, হাসলো। ভীত হলো না, চঞ্চল হলো না, আর আর মেয়েরা যা করে, ঘরে গিয়ে দোর বন্ধ করলো না।

কালীপদ স্তব্ধ হয়ে গেল, এক মুহূর্ত। বললে, 'এ কি, স্নান করেছ যে। এসো, রঙ দিয়ে দি।'

হায়, সে গেল অনুমতি চাইতে। হয়তো সেইটেই ভদ্রতা। কেননা প্রতিপক্ষ যেখানে বাধা দেয়না প্রার্থীও সেখানে দুর্বল। দস্যুতাটা সেইখানেই সম্ভব যেখানে আছে একটা সক্রিয় প্রতিরোধ।

শুভ্র, ভদ্র গলায় শর্বরী বললে, 'না। ও আমার ভাল লাগে না।'

এতটা বুঝি কারুরই ভালো লাগলো না। প্রণতির মা বললেন, 'আহা, আবার না-হয় স্নান করবি—দোলের দিন—এত দূর থেকে এসেছে—'

হুড়মুড় করে' এসে পড়লো সব—মদন, বদন, বাসন্তী ও তাদের সঙ্গীরা। সুরু হয়ে গেল রঙিন উন্মত্ততা—দেয়াল-মেঝে ঘর-বারান্দা সব লাল হয়ে গেল। তার মাঝে শর্বরীই একমাত্র অস্পৃষ্ট।

দুই শাশুড়ি তখন নিচে জলযোগের ব্যবস্থায় ব্যাপৃত, তাঁদের ডাকে সেই অভিমুখেই কালীপদ যাচ্ছে, হঠাৎ শর্বরী তার সামনে এসে দাঁড়ালো। হাসিমুখে বললে, 'এত লালিমার মাঝে আমার সাদা থাকাটা কেমন বেমানান লাগছে। দিন, দিন মাথিয়ে আবির।' বলে' সে ঈষৎ উৎসুক ভঙ্গিতে মুখ বাড়িয়ে ধরলো। আর, আশ্চর্য, বিয়ের কনে যেমন চোখ বুজে মুখ দেখায় তেমনি তার চোখ বোজা।

দু' পকেট থেকে দু' মুঠ আবির নিয়ে কালীপদ স্তব্ধ হয়ে রইলো। পরে হাতের আবির সব ছুড়ে ফেলে দিয়ে শর্বরীর কপালে বুড়ো আঙুল করে' বড়ো একটা সে টিপ আঁকলো, আর সেটা একটানে টেনে নিয়ে গেল মাথার চুলের মধ্যে।

কালীপদ চলে' যাচ্ছিলো, শর্বরী বললে, 'বেশ তো। আমি দেব না?' বলে' আবিরের জন্যে সে হাত পাতলো।

কালীপদ চোখ বুজলো না, দেখলো সেই আবির তার পাশ-শুর উপরে রেখে শর্বরী তাকে প্রণাম করছে।

তারপরে হলো হাবুল, প্রণতির প্রথম ছেলে, মারা গেল প্রণতির বাবা, বিয়ে হলো শর্বরীর—সব একই স্বাভাবিক নিয়মে। শ্বশুরের মারা যাবার পর কালীপদর মনে হয়েছিলো শর্বরীর

বিয়ের সন্তাব্যতাটা আরো দূরে গেল মিলিয়ে এবং এই ভেবে মনে বোধহয় একটু সান্ত্বনার ভাব এসেছিলো। এ কারণাতীত শত্রুতাটা যে কেন কালীপদ তা ভেবে পেতো না। হয়তো বা পেতো, যখন নিজের অবচেতন মনটাকে চিরে-চিরে দেখতে চাইতো ভিতরে। যাকে আমি পাইনি, তাকে আর-কেউই না পাক এমনি একটা হীন, ক্ষুদ্র, লোভী প্রবৃত্তি। তখুনিই সে আবার সজাগ হয়ে হয়তো-বা নিজের মনের কাছে লজ্জিত হয়ে চিঠি লিখতে বসতো সম্ভবনীয় সম্বন্ধ-সন্ধানো বলতে গেলে, এখন সে-ই শর্বরীর মুরুব্বি, অভিভাবক, সে ছাড়া কার মুখের দিকে সে চাইবে? বি-এ পাশ-করা মেয়ের আর ভবিষ্যৎ কী—বিয়ে-ছাড়া? এবং সে-বিয়ে বেশ একটা সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ বিয়ে হওয়া দরকার।

আর, সেইটেই ভাগ্যের রসবোধ, কালীপদরই চিঠির জালে শিকার ধরা পড়লো—তারই প্রায় বন্ধু, শিথিল অর্থে বন্ধু, নৃপতি সেন, অডিট-অ্যাকাউন্টস্-এ চাকরি করে—পাঁচ শো টাকা মাইনে। বহুদিন বিয়ে করে নি, মনের মতো পাত্রী পায় নি বলে', আর তার মনের মতো পাত্রী মানে ছ' ফুট দীর্ঘতা। কিন্তু আশ্চর্য, শর্বরীকে দেখলো কি এক বাক্যে ঘাড় হেলালো, সে যে পাঁচ ফুট ছ ইঞ্চির বেশি নয় সেটা প্রত্যক্ষ ঠাহর করেও। হয়তো বুঝলো যে ছ' ফুটটা নিছক বিলিতি গোঁয়ার্তুমি, কিন্তু এমন একটি মেয়ে ছেড়ে দিলে বাকি জীবনটাও নিরর্থক হয়ে যাবে। এমন সে একটা তাড়া দিলে যেন এরি জন্যেই সে এতদিন প্রতীক্ষা করেছে। সে একটা এমন তাড়া যে মেয়ের দিককে প্রস্তুত হবার পর্যন্ত অবকাশ দিতে চায় না। প্রস্তুত হওয়া মানে তো আর্থিক সংস্থান করা—তার একবিন্দু প্রয়োজন নেই। টাকা তার নিজেরই কিছু আছে।

'বুঝলে কালী-দা,' বললে নৃপতি, 'নিজের টাকা দিয়ে দারিদ্র্য কিনেও আনন্দ আছে, যেখানে স্বয়ং ময়ূরই পাওয়া যাচ্ছে সেখানে আলাদা করে' ময়ূরপুচ্ছ নেবার আমি কোনো অর্থ দেখি না।'

অদ্ভুত, প্রায় অলৌকিক বলা যায়। শর্বরী এমন একটা কিছু চোখ-ঝলসানো মেয়ে নয়, আর নৃপতির জন্যে ময়ূর ছেড়ে উট পাখির দল সব গলা উঁচিয়ে বসে' আছে—এ তার কী সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার! আধুনিক যুগে টাকার দিকে দৃষ্টি নেই এ কী রকম শিক্ষা, অথচ টাকার জন্যেই বিয়ে বিয়ের জন্যে টাকা নয়। কালীপদ আজ নিজেকে সম্পূর্ণ পরাভূত মনে করলে, শর্বরীর বিয়ে হয়ে গেল বলে' নয়, শর্বরীকে আর কেউ তারই মতো পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দেখলো বলে'।

ভেবেছিলো, যাবে না সে বিয়েতে। কিন্তু সবাইর আগে ভদ্রতা, সামাজিক সৌষ্ঠব। সে না গেলে এত বড় ব্যাপারটা ঘটে' উঠবে কি করে'? নৃপতি সন্ধিপ্ত করতে চায় কেননা সে অসহিষ্ণু; আসলে যে-ব্যক্তি স্থির, সহ্য করবার শক্তি যার অপরিসীম, ত্যাগ করবার মহত্ত্ব যার অনেক, সেই জানে ঘটনাটা আসলে কত বিরাট।

বিয়েটা যে একটি নিরভিভাবক নিঃসম্বল মেয়ের কালীপদ তা বুঝতেই দিলে না। ভূতের মতো একরাশ খরচ করলে, দোলের দিনে মুঠ-মুঠ আবিরের মতো। নৃপতি চায় না বলে' শর্বরী পাবে না এটা উদারতার বেশে স্বার্থপরতা ছাড়া কিছু নয়—অতএব যা সব জিনিস কালীপদ কিনলে গয়না থেকে আসবাব, তুলো থেকে সিল্ক, বই থেকে অঙ্গরাগের টুকিটাকি

সমস্ত শর্বরীর জন্যে, শর্বরীর উপযোগিতা বিচার করে'। প্রণতি জলে' যাচ্ছিলো, তাকে প্রবোধ দিয়ে কালীপদ বললে, 'নিজের জ্যেষ্ঠত্বের মর্যাদা রাখো। তোমারই আশ্রিত গরিব ছোট বোন, চিরকালের জন্যে পরের কাছে চলে' যাচ্ছে।'

বিয়ের এ দুটো দিন কালীপদ ভুলেও একবার মেয়ে-মহলে উঁকি মারে নি, বাইরে লোক খাটিয়েছে অগণন কাজে, রাঁধুনে বামুন থেকে ডেকরেটার, কলাপাতা থেকে কুশাসন। জলের ড্রাম কটা লাগবে, মাংস ওজন করে' নেবে কে, রেডিয়োটা খাটাবে কোথায়—সব কালীপদ। এমন কি বরযাত্রীদের সামনে সিগারেটের ট্রে-টাও সেই এগিয়ে ধরছে। কোথাও যেন ভদ্রতার একটুকু ত্রুটি না হয়। তাই তার সময় নেই এক ফাঁকে দেখে আসে শর্বরীকে আজ বিয়ের শাড়িতে কেমন মানিয়েছে, আজ তার আনন্দের অতিশয়তা সেই উদ্ধত দাঁতটি পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে কিনা। সময় নেই সে দেখে, সময় নেই সে শোনে, সময় নেই সে বোঝে এটা কী হচ্ছে এই ঈশ্বরের পৃথিবীতে।

বর-কনে বিদায় হয়ে গেলে সে একটা ইজি-চেয়ার আশ্রয় করে' শুয়ে পড়লো। এবং সমবেত বাড়ির লোকদের সঙ্গে সহাস্য-উচ্চ তরল কণ্ঠে গল্প করতে লাগলো, কোথায় ও কার এবং কতটা ও কী মজার ব্যাপার হয়েছে বিয়েতে। আশ্চর্য, কিছুই অমাধ্য নয়।

প্রণতি থেকে গেল মেয়ে-জামাইর জোড়ে ফিরে-আসা পর্যন্ত আর কালীপদ একা তার কর্মস্থলে ফিরে এল।

স্বাভাবিক নিয়মে কাহিনীর এখানেই শেষ হওয়া উচিত। শেষ সত্যিই হতো, কালীপদ যদি ভুলতে পারতো শর্বরীকে, ভুলতে পারতো মানে স্বাভাবিক নিয়মে উপেক্ষা করতে পারতো। তাই শেষ সত্যিই হলো না।

ফিরে এসে প্রণতি প্রবল একটা গা-বমি-বমি ভাব দেখালো; বললে, 'মা গো, বিয়ে করতে-না-করতেই মেয়েটা কী বেহায়াপনা সুরু করেছে যদি ছাখ! বুড়ি হয়ে বিয়ে হলেই মেয়েগুলো এমনি বেহেড হয়ে যায়।' কৌতূহলী হয়ে খোঁজ নিয়ে কালীপদ দেখলো, অসঙ্গত কিছুই করেনি শর্বরী, গালি তার সৌভাগ্য-গর্বটা নানা ভঙ্গিমায় ব্যক্ত করে' বেড়াচ্ছে। মানে, বিয়ের পর প্রণতি যা করেছিলো, সব মেয়েই যা করে, সেইটেই একটু চড়া রঙে সে ফুটিয়ে তুলছে, তার নতুন কী গয়না, নতুন কী আসবাব, নতুন কী অধিকার—সঙ্কেতে-ব্যাখ্যানে তারই একটা বিস্তৃত ইস্তাহার দিচ্ছে—আর তাই অসহ্য লাগছে প্রণতির। আগে শর্বরীর যা হয়েছিলো এখন প্রণতির তাই হচ্ছে—সেই উদ্দেশ্যহীন অশরীরী হিংসে। এতটা কেন হবে শর্বরীর—কী আছে তার যোগ্যতা, সেই নির্ভাষ অভিযোগ। আর যতটুকু তার হলো সবই তো এই প্রণতির কৃপায়। পরগাছা যখন শাখা-পত্র মেলে ছায়া ফেলতে চায় তখন মহীরুহ অপমানিত বোধ করে।

তাই ছুটি হলেই কোলকাতা যাবার জন্যে প্রণতি আর কালীপদ ব্যস্ত হয়ে ওঠে না—একই মূল কারণে, অথচ তার দুটো ভিন্নমুখিতা। একই কারণ—কেননা কোলকাতা গেলেই মা-মাসির সঙ্গে দেখা করতে হবে এবং সেখানে দু'-বোনের দেখা না হয়ে আর উপায় থাকবে না। দু' জনের

কাছেই শর্বরীর উপস্থিতিটা অসহনীয়—মূলকারণ এইটেই, যদিও সেটা দ্বি-মুখী: প্রণতিরটা হিংসে, কালীপদরটা প্রেম, ভদ্রভাষায় ভীরুতা। তাই তারা ছোট ছুটি হলে শিলং-দার্জিলিঙ করে, বড় ছুটি হলে রেঙ্গুন-সিঙ্গাপুর বেড়িয়ে আসে।

কিন্তু সেবার কোলকাতা না গিয়ে পারা গেল না যখন দ্বিতীয় শিশুলাভের প্রাক্কালে প্রণতির অবস্থাটা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিলো। প্রণতিদের বাপের বাড়িতে উঠলো না, উঠলো তাদের নিজেদের বাড়িতে, বিয়েতে যেটা যৌতুক পেয়েছিলো তারা, এবং যেটা এতদিন ভাড়া টানছিলো। প্রণতি যখন আঁতুড়-ঘরে, শর্বরী দেখতে এসেছিলো তাকে। এবং সে-পরিচ্ছেদটা কেটে গেলে তার সঙ্গেও দেখা হবে সেই প্রতীক্ষায় কালীপদ নিজেকে ভদ্রতায় আবৃত, অব্যাহত করে' রাখলো। কিন্তু আশ্চর্য, শর্বরী তার সঙ্গে দেখা করলো না। যেন তার মনের ভাবটা সে ধরে' ফেলেছে তার জন্যে একটা উগ্র রাগ তার শরীরে। মোটরে যখন সে গিয়ে উঠলো ভদ্রতার জন্যে এগিয়ে দিতে এসে কালীপদ তাকে একটু দেখলো। সেটা রাগ না গর্ব, নিষ্ঠুরতা না অকৃতজ্ঞতা কালীপদ কিছুই বুঝতে পারে না, তবে এইটুকু বোঝে মেয়েদের আসল সৌন্দর্য কৌমার্যে নয়, সাধব্যে, মানে বিয়ের পর, শিশুর জননী হয়ে। শর্বরী তার ছেলেকে সঙ্গে করে' নিয়ে আসেনি।

আচ্ছা, তার মনের ভিতরটা, তারো ভিতরটা, বুঝতে পেরেছে শর্বরী? এ কথনো বুঝতে পারে মানুষে, যার চোখের বাইরে দৃষ্টি নেই, স্পর্শের বাইরে উপস্থিতি-বোধ নেই, মনের বাইরে অনুভূতি নেই? এই যে একটা ইচ্ছা বা বেদনা সে দিনে-রাত্রে চিত্তের অন্তিম প্রান্তে বহন করছে, যার ভাষা নেই, নিশ্বাস নেই, সঙ্কেত নেই, চাঞ্চল্য নেই, যেটা সে নিজে বুঝতে পারে না, সেটা শর্বরী বুঝবে? উন্মাদ হলেই কালীপদ সেটা কল্পনা করতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ সে সুস্থ, সভ্য ও সহজ ততক্ষণ সেটা সে বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না। আমি তোমাকে ভালবাসি বলেই তুমিও আমাকে ভালবাসো এটা নিতান্ত বালকীয় মনোবিলাস, কেননা, তুমি কি করে' ভাববে যে তোমাকে আমি ভালবাসি বা ভালবাসতে পারি? অতএব এটাকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে হবে, কেননা অল্প-বোঝাটা না-বোঝার চেয়ে মারাত্মক। প্রকাশেই মুক্তি, এবং প্রকাশেই তার মৃত্যু। এবং সেই মৃত্যুটাই সে চায় যতো শীঘ্র সম্ভব। কিন্তু প্রকাশ করবার ভদ্র কী রীতি আছে কালীপদ তা ভেবে বার করতে পারে না। কাব্যের ভাষা সেখানে স্থূল, অশোভন আচরণ সেখানে ঘৃণ্য, নাটকীয়-তাটা বর্বরতা। আর সব সে পারে, কিন্তু তার মর্যাদা তার সম্ভ্রম তার ভদ্র সামাজিকত্ব সে কিছুতেই বিসর্জন দিতে পারে না। আর কোনো-কিছুকেই সে ভয় করে না, যত করে'থবরের কাগজকে।

সুতরাং এর প্রতিকার নেই। একমাত্র প্রতিকার আছে সময়ের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেয়া—সর্ব-বিস্মারক, সর্ব-অপহারক যে সময়। কিন্তু কালীপদর বিয়ের পর এই দশ বৎসর কেটে গেল, তিনটি সন্তানের সে পিতা, তবু, আশ্চর্য, সময় তাকে জীর্ণ করতে পারে নি। তার বিয়ের চার বছর পর শর্বরীর বিয়ে হয়, কোথায় সে আছে, কয়টি তার শিশু প্রণতি বলতে পারে, তবু সময় তাকে ক্ষয় করতে পারে নি। সময় বড় স্বল্প, বড় সঙ্কীর্ণ। ভোলবার জন্যে মানুষের দীর্ঘ দিন বাঁচা উচিত এবং ভদ্রতার ও সভ্যতার এত বেশি উন্নতি হওয়া উচিত যাতে মনটাকেও চুপসে অসার করে'

দেওয়া চলে। ভদ্রতার খাতিরেই সে সন্ন্যাসী হতে পারে না। তাই সে খায়-দায়, নিজের কর্তব্য করে, স্ত্রীর প্রতি, পরিবারের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি; আনন্দ করে, ব্যায়াম করে, সভা-সমিতি করে আর আত্মার নির্জনতায় ঈশ্বরের মুখোমুখি বসে' নিরন্তর তাকে প্রশ্ন করে: কেন, কেন, কেন?

জীবনে যদি না-ই জানাতে পারে মৃত্যুতে জানাতে পারে না?—এ-ও একেক সময় ভাবে কালীপদ। মৃত্যুতে মানে আত্মহত্যায় নয়—কালীপদ এত মূর্খ, এত অভদ্র কখনোই হতে পারে না। মৃত্যুতে মানে, যখন সে স্বাভাবিক নিয়মে মরবে। ধরো, সে একটা চিঠি লিখে রেখে গেল। উঃ, অসম্ভব! সেই বিজয়া-দশমীর পর ফুলন্ত ভাষায় বাঙলা লেখবার সে আর চেষ্টা করে নি—প্রশ্নের অতীত সেই দুঃসাধনা। কিন্তু ধরো, সে যদি একটা উইল করে' রেখে যায়? হঠাৎ তাকে যেন কে চাবুক মারলো। প্রণতিকে, তার সন্তানদেরকে, বঞ্চিত করবার তার কী অধিকার আছে?

সুতরাং প্রতিকার নেই। তাই হাওয়া বদলাতে সাঁওতাল-পরগণার নির্জন এক সহরে এসে সে হাজির হলো।

প্রণতিরা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে, কালীপদ একা-একা বেড়াচ্ছে রাস্তা দিয়ে, সকালের রৌদ্রে, দূরের পাহাড়টাকে লক্ষ্য করে'। রাস্তাটা নতুন, দূরে-দূরে দু'পাশে নতুন বাড়ি উঠছে। বাড়ি শেষ না হবার আগেই কোনো-কোনো গৃহস্বামী এসে পড়েছে সপরিবারে। এরই একটা বাড়ির পাশে খানিকটা খোলা জায়গায় বিক্রির ইস্তাহার ঝুলছে দেখে কালীপদ ভাবছিলো এমনি একটু নিভৃত কোণে তার নিজের জন্যে ছোট্ট একটি বাড়ি তৈরি করলে কেমন হয়, এমন সময় কাছাকাছি কোথা থেকে কে অতি শ্রান্ত ও অতি কাতর গলায় বলে' উঠলো: 'বাবা, এতদিন পরে দেখা পেলাম।'

কে, কোথায়, কালীপদ চমকে উঠলো। চারদিকে চাইতে লাগলো, কাছে, দূরে, পাহাড়ের দিকে।

'আজো কি চোখে পড়ছে না?'

মেয়ের স্বর। আর সে-মেয়ে পাশের বাড়ির বারান্দায় বসে' রোদ পোহাচ্ছে। অত্যন্ত শীর্ণ, রুগ্ন মেয়ে—র‍্যাপারে গা ঢাকা থাকলেও যেন পাঁজর গোনা যায়। কালীপদ চিনতে পারতো না, যদি না চোখে চোখ পড়তে মেয়েটি হেসে না উঠতো আর দেখা না যেত তার উদ্ধত সেই দাঁত।

'এ কি, তুমি?'

'তবু ভাগ্যি, এত দিন পর চিনতে পারলে।' মেয়েটির চোখের কোটরে জল ছলছল করে' উঠলো।

'তোমার কী হয়েছে, শর্বরী?'

'হয়েছিলো, কঠিন একটা রোগ, নাম শুনো না। এখন ভালো হয়ে উঠেছি।' শর্বরী দুর্বলতায় টলতে-টলতে উঠে দাঁড়ালো।

'আর-সব কোথায়?'

'কেউ আছে হয়তো, কেউ নেই। জানি না। কিন্তু আমি আছি। এস, রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে আছ কী! ছায়ায় এস।' শর্বরী দেয়ালটা ধরে' ফেললো।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভীরু, ভদ্র কালীপদ দ্বিধায় দুলতে লাগলো যাবে কি যাবে না!

আশালতা দেবী
৭৭, বেলতলা রোড, কলিকাতা

দোহার

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ফটকা বাজারে তেজি হ'ল বুঝি হেসিয়ান,
শতকরা সাড়ে তিনে, মন্দীর বেশী টান,
পড়ি আর করি অফ্‌শোষ!
মূলধন শুধু আক্রোশ;

তাই কবিতায় চিপ্‌ টেন্‌ কাটি ধারালো।
সখা সোভিয়েট কান্তেটা তার বাড়ালো?
শসিমিরে বুঝি স্বস্তিক?
বন্ধু হোয়োনা নাস্তিক,

মূলের মর্ম্ম নাই বোঝ আছে ত' সটীক
সহজ ভাষ্য; তাই পড়ো কোন বেরসিক
বল, ধুয়ো নিয়ে ধরে ভুল।
থাক্‌ না বজায় দুইকূল,
প্রফেসারি যদি না মেলে সিনেমা আছে ঠিক!

আবহমান

জীবনানন্দ দাশ

যেখানে রয়েছে আলো পাহাড় জলের সমবায়—
তবুও সেখানে যদি আবিষ্কার করি প্যারাফিন
অনেক মাটির নিচে,—অথবা সেখানে যদি সংগ্রাম বিলীন
অজস্র অস্পষ্ট মুণ্ড অনুকম্পা হৃদয়ে জাগায়,
তাহ'লে প্রভাত এলে মনিয়া পাখির পিছে কি করে' বালক
ভেসে যাবে উজ্জ্বল জলবিম্বের মত হেসে ?
কি ক'রে বা নাগরিক নিজের নারীকে ভালোবেসে
জেনে নেবে হেমন্তের সন্ধ্যার আলোক
গ্যাস আর নক্ষত্রের লিপ্সা থেকে জেগে
যারা চায় তাহাদের কাছে তবু স্মিত সমন্বয় ?
মৃতদের উপেক্ষিত পীত দেহ—বলো,—ক্ষমাময়।
বৃত্তের মতন—এসো,—ঘুরি মোরা বঙ্কিম আবেগে।

সূর্য্যসাগর তীরে

জীবনানন্দ দাশ

সূর্য্যের আলো মেটায় খোরাক কার :
সেই কথা বোঝা ভার।
অনাদি যুগের অ্যামিবার থেকে আজিকে ওদের প্রাণ
গড়িয়া উঠিল কাফ্রির মত সূর্য্যসাগর তীরে
কালো চামড়ার রহস্যময় ঠাস বুনুনিটি ঘিরে।

চারিদিকে স্থির-ধূম্র-নিবিড় পিরামিড যদি থাকে—
অনাদি যুগের অ্যামিবার থেকে আজিকে মানবপ্রাণ
সূর্য্যতাড়সে ভ্রূণকে যদিও করে ঢের ফলবান,—
তবুও আমরা জননী বলিব কাকে ?
গড়িয়া উঠিল মানবের দল সূর্য্য সাগর তীরে
কালো আত্মার রহস্যময় ভুলের বুনুনি ঘিরে।

প্রলাপী

বিরাম মুখোপাধ্যায়

কেন, কেন তুমি উন্মাদের মতো
বার-বার এ-কথা উচ্চারণ করছো :
মেসিন জীবনকে নিরুজ্জ্বল করেছে,
নিঙ্‌ড়ে নিয়েছে জীবনের সমস্ত রক্ত !
কেন,
কেন তুমি কান্নার দীনতা নিয়ে বলছো :
জীবন নির্ব্বাপিত, নিঃশেষিত শেষতম উত্তাপ,
আর মাংসের দেয়াল
লোহার আঘাতে বিদীর্ণ !
আর, ক্ষুধার গ্লানিতে বাঁকাচোরা কঙ্কাল
দিনরাত ধুঁকছে,
আর সেই শুষ্ক কঠিন কঙ্কালে
ক্ষুধিত দানবের ইস্পাত-ধারালো দাঁত-বসানোর শব্দে
সভ্যতা মূর্চ্ছিত !
কেন, কেন তুমি এ-সব প্রলাপ বক্‌ছো !

তুমি অসুস্থ,
আগে শাসন করো তোমার প্রগল্‌ভ জিহ্বাকে,
আগে প্রকৃতিস্থ হও নিজে !
হ্যাঁ, তুমি অসুস্থ, অবনমিত, তুমি আহত !
নিশ্চয়ই, জীবন কী, তুমি স্পষ্ট জানো না !
জীবনকে তুমি প্রত্যক্ষভাবে চেনো না !
আর তাই নির্জ্জলা লৌহ-স্তুতিতে তুমি ক্লান্ত,
তাই জীবনের গভীরতম অনুভূতি থেকে তুমি বঞ্চিত,
তাই তুমি অসহায় নির্ব্বোধ পশুর মতো
খাঁড়ার নিচে মাথা রেখে অর্থহীন আর্ত্তনাদ করো !

তাই তুমি প্রতিমুহূর্তে
অপমৃত্যুর হাতে লাঞ্ছিত, লুণ্ঠিত !

ক্ষমতা কী লোহার চাকার
মানুষের বুকের অগ্নিপিণ্ডকে ছিন্নভিন্ন করে !
ক্ষমতা কী মেসিনের
জীবন্ত মানুষকে স্পর্শ করে !
কে না জানে, যন্ত্রদানব
জীবনের বিদ্যুতাগ্নির কাছে
সঙ্কুচিত, সন্ত্রস্ত !
কে না জানে,
আত্মার এককণা স্ফুলিঙ্গে
পৃথিবীর সহস্র লৌহখনি মুহূর্তে ভস্মীভূত হয় !

(আগ্নেয়গিরির মুখে গলিত এ দিন—
দ্বাদশ সূর্য্যের চিতা সন্ধানিছে কীটদষ্ট মেরুদণ্ডগুলি।
আমাদের শোণিতের ভিন্ন অঙ্গীকার,—
আমরাই স্বর্ণ-কীর্ত্তি অগ্নির নিকষে।
...কে জোগাবে, কে জোগাবে কাল
ধূম্রবিষ, সর্পিল উদ্গার
চিম্‌নীর মুখে ?)

এ-কথা তুমি কেন বলছো,
মেসিন জীবনকে নিরুজ্জ্বল করেছে !
মেসিন কী জীবনকে স্পর্শ করতে পারে,
ধাতব-বিষ কী তপ্ত রক্তের জোয়ারে স্থান পায় !
জীবন যন্ত্রের ঊর্দ্ধে,
জীবন স্পর্শাতীত শক্তির অধিপতি
আকাশের চাঁদোয়া পার হ'য়ে নিরুপম জ্যোতির্লোকে তার পথ—
সাধ্য কী, চিম্‌নীর ধোঁয়া আকাশের নীলকে এতটুকু কলঙ্কিত করে !

বহ্নি ও ধূম্রপটলে ইউরোপ

যামিনীকান্ত সেন

ইউরোপের কোন বাঙ্গকার সেদিন রহস্য করে' বলেছিল চেম্বারলেনের হাতে যদি ছাতার পরিবর্ত্তে হিটলারী তরবার থাকত কিম্বা হিট্‌লার যদি ছাতা নিয়ে তৃপ্তি পেত তবে ইউরোপে এই বিস্ফোরক বজ্রমুষ্টির অভিনয় হ'ত না। অর্থাৎ চেম্বারলেন গোড়ার দিকে শক্ত হ'লে হিটলার লড়াই করত না। এসব প্রতীতি বাতুলের পক্ষে সম্ভব।

পোল্যাণ্ডের এই হাউট্‌জারটি জার্ম্মানদের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে

অতি তুচ্ছ বা সাময়িক কারণে কোন বিশ্বগ্রাসী বহ্নিকে কেউ জ্বালাতে চায় না। ইউরোপের যুদ্ধ বহুকাল হ'তেই চলেই এসেছে—এবং এতকাল যা'কে শান্তি বলা হয়েছে তা'ও ক্ষুরধার অনিশ্চিত পথে চলেছে—যা' যুদ্ধ অপেক্ষাও অধিক যন্ত্রণাজনক। কারণ যুদ্ধের আয়োজন ও আন্দোলন কখনও থামেনি।

ইউরোপীয় সভ্যতা এ শীলতার ভিতর প্রচ্ছন্নভাবে সমরতত্ত্বই ধূমায়িত হয়ে এসেছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও গবেষণা সমরের প্রয়োজনীয়তাকেই মুখ্য ব্যাপার মনে করেছে। এমন

কোন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি যা' কারও বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর যন্ত্রযুগের বিরাট আবিষ্কারগুলি সমগ্র পৃথিবীর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়েছে। সে সব যন্ত্রের সাহায্যে নানা দেশের পারিবারিক ও গ্রাম্য শিল্পকে ধূলিসাৎ করা হয়েছে—ভারতেও চীনে গৃহে গৃহে হাহাকার উঠেছে। এই অহিংস সংহার সমগ্র পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতাগুলিকে পঙ্গু করে' দিয়েছে। ফলে চীন, ভারত, পারস্য প্রভৃতি রাজ্য কক্ষচ্যুত হয়েছে। ইউরোপ মৃত্যুর ভিতর দিয়ে, সংগ্রামের ভিতর দিয়ে বিশ্বকে পেতে চায়। বস্তুতঃ শক্তিচর্চ্চার এটাই প্রকৃষ্ট উপায়। তাই মৃত্যুর মন্থনে প্রতীচ্য অমৃতকে পেতে ছুটোছুটি করে।

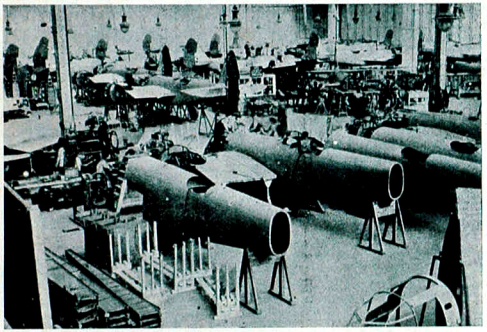

"Bristol Blenheims" দু'টনের উপুর বোমা নিয়ে ঘণ্টায় ২৯৫ মাইল বেগে উড়ে চলে। পৃথিবীতে এ রকম শক্তিশালী বম্বার এ-পর্য্যন্ত আর তৈরী হয়নি

ইউরোপীয় ভাবসমুদ্রের বুকে সুগুপ্ত ও সুরক্ষিত কুম্ভের ঢাকা আজ খুলে গেছে—তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে দৈত্য ধূম্রায়িত বিরাট কলেবর নিয়ে! আর রক্ষা নেই!

কিন্তু এর ভিতর অধ্যায়ে ব্যাপার প্রচুর আছে। প্রত্যেক সংগ্রামই নূতন তত্ত্ব, নূতন বার্ত্তা ও নূতন বিজ্ঞানের বাণী বহন করে' অগ্রসর হয়। ১৯৩৯ সালের যুদ্ধের আবেষ্টন ও আয়োজন ১৯১৪ সালের মতই নয়। কুড়ি বছরের আগেকার সাহিত্য ও ভাষা এ যুগের মত মোটেই নয়; সেকালের রসায়ন বিজ্ঞানও আজকার তুলনায় তুচ্ছ—সে সময়ের সমস্যাগুলিও এ যুগের মত নয়। এবার সব নূতন কথা ও নূতন জটিলতা সৃষ্টি করেছে।

১৯১৪ সালে ইউরোপ মসগুল ছিল ভাবের কক্ষে দু'টি বিপরীত প্রতীতির আলোড়নে। সে সময় বাস্তববাদ এসে পড়েছিল চরম সীমায়—এজন্য মনের কোণে এসেছিল তিক্ততা

ও রিক্ততা। সীমার পাকা গাঁথুনি ভাঙা শক্ত—অথচ তা' ভাঙা প্রয়োজন হয়েছিল কারণ জগদ্দল পাথরের পথ ইউরোপের অগ্রগতি তা' রুদ্ধ করে। Superman বা অতিমানব কল্পনা জর্ম্মণীতে একটা ঝটিকা তোলে Nietzche-এর প্রেরণায়—তার সূত্রপাত করেছিল গোপেনহৌরের "Wil'-বাদ"। এই অতিমানব কল্পনা সাহিত্যকে আচ্ছন্ন করে এবং শিল্পী Klingerকে নূতন প্রেরণা দান করে। এই কল্পনাকে মানুষ ও জাতিসমূহের ভিতর ভেদ-সৃষ্টি করে' একটা বিরূপ বাস্তবতাকে জন্মদান করে। অপরপক্ষে বার্গসঁও বাস্তববাদের অবাস্তবতা প্রমাণ করেন কারণ তাঁর মতে ইউরোপীয় দর্শন যথার্থ বাস্তবকে হৃদয়ঙ্গম করেনি। "Duree" কে অস্বীকার করে' এবং "elan vital" না দেখে ইউরোপের তত্ত্বদর্শন বাস্তবতার পঙ্কিল হ্রদে পথ হারিয়েছিল। আর্টেও এল বিরূপ বজ্রের অজস্র আহ্বান ও বিপ্লব। অতিমানবকে মানবের সহিত সঙ্ঘর্ষে আসতে হল, কারণ এর ভিতর কোন সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি ইউরোপীয় তত্ত্ব স্বীকার করেনি। ফলে এল তথাকথিত Superman ও Man-এর সংগ্রাম। তাতে মানুষের বহুমুখী অতিমানবের আয়োজনে অগ্রগতি চূর্ণ হল।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এসেছে নূতনতর তত্ত্বের সংঘাত। সকলকে অতিমানব কল্পনা করে' একজনকে সে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে। সে সমগ্র জাতিকে নিজের কবলে এনে এক রাষ্ট্রীয় অদ্বৈতবাদ সৃষ্টি করেছে, মধ্যযুগের Patriarchæ System ও প্রাচ্যের রাজন্যবাদ কতকটা এই শ্রেণীর।

এযুগের অতিবাস্তববাদ নব্য Neo-Realism-এর সঙ্গে তাল রক্ষা করে' এক নব্য রহস্য উদ্ঘাটন করেছে। বাস্তবের সত্য স্বরূপ বাস্তব নয়—এ হচ্ছে আর্টে Sur realism এর রক্ষা—তা এযুগের মনস্তত্ত্বরই প্রতিফলক। জর্ম্মণীতে হিটলার ও ইতালীতে মুসোলিনী অনুভূতির এই অতিবাস্তবশীর্ষে সমাসীন হয়েছে। Nazism হিটলারকে একছত্র করেছে National Socialism-এর দোহাই সত্ত্বেও— Facicism মুসোলিনীকেও সে মর্য্যাদা দিয়েছে। মোটকথা, এ যুগ totalitarian—Democracyর নয়। Individual-এর কোন মূল্য নেই—Coalescence হ'ল বড় কথা। স্বাধীনতা একের নয় সমগ্রের—এটাই হ'ল রহস্যাপ্লুত দুর্লক্ষ্য বাস্তববাদ—নব্যযুগের দান। Karl Marx-এর class struggle "সম্পর্কীয় thesis-এর এটাই হ'ল নব্য antethesis. বহুত্ববোধের অভাব ও শ্রেণীর দ্বন্দ্বকে নির্ব্বাসন করে' আধুনিক সংহতি একটি নীর্যকেই প্রামাণ্য করেছে—আর সব হয়ে পড়েছে অবাস্তব, এমনকি অবাস্তব। Territorial ন্যাশানবাদের পরিবর্ত্তে racial nation কল্পনা বৃহত্তরজর্ম্মণী-কল্পনা সম্ভব করে। গত যুদ্ধে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হারিয়ে জর্ম্মণচিন্তা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায়। জর্ম্মণী ভৌগোলিক দিক দিয়ে নিজকে দেখা তাই ত্যাগ করল। Verselles সন্ধি রক্তগত বংশের দোহাই দিয়ে কয়েকটা রাজ্য তৈরী করল এবং অন্যত্র সৃষ্টি করল, ত্রিশহুর রাজ্যের মত কতকগুলি Mandated territories যার কল্পনা ইউরোপীয় রাষ্ট্রবাদে ছিল না। Czechs বা Slovaksদের রক্তগত ঐক্যের সাহায্যে নূতন জাতি গঠনের প্রয়াস সম্ভব হ'ল। জর্ম্মণীতেও এই রক্ত সম্পর্ক ও racial feeling এক বিরাট মাদকতা সৃষ্টি করল। স্বতদেহ জর্ম্মণ বহুকাল পরে Greator Garmanyকে চোখে দেখল।

জার্ম্মাণীর শক্তি স্থলে

জার্ম্মাণীর এই য়্যান্টি-এয়ার-ক্র্যাফ্ট-এর ক্ষমতা সমগ্র ইউ-রোপের ঈর্ষার বস্তু। বারো হাজার ফুট উপরের বিমান-বাহিনীকে ভূপাতিত করতে এর আর সমকক্ষ নেই।

বৃটেনের শক্তি জলে

উত্তর সমুদ্রে বৃটেনের বিরাট নৌ-শক্তির গুরুগম্ভীর চাল-চলন দেখে হিটলার আতঙ্কিত-উত্তেজনায় তাড়াতাড়ি Anglo-German নৌ-চুক্তি-সম্পাদন করতে বাধ্য হন।

অ'তে আগুনে ঘি ঢালা হ'ল কিছু ভদ্রভাবে। জর্ম্মণ তাই জর্ম্মণজাতি ও জর্ম্মণ রক্তজাত জনতার কর্তৃত্বের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠ্ল ইউরোপের সকল territoryর সীমা ভেঙে। ফলে এক ভাবের বিসুবিয়স্ অগ্নি উদ্গীরণ কর্তে সুরু কর্ল।

এই রক্তসম্পর্ক ও tribal প্রেরণা জর্ম্মণীকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করে। এ প্রসঙ্গে racial urge-এর Ludendörf একটা নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপনের চেষ্টা করে খ্রীষ্টধর্ম্ম বর্জ্জন করে'। জর্ম্মণী নিজের প্রাচীনতম যুগের দেববাদকে (mythology) স্বীকার করে' এই পথে অগ্রসর হয়। জর্ম্মণীর দর্শন ও বুদ্ধিবাদকে (Intellectual Philosophy) বর্জ্জন করে' "Instinct" "blood" "pedigree" "racial urge"কে শিরোধার্য্য করে। এই racial ম্যাপ যে বৃহত্তর জর্ম্মণী সৃষ্টি করে আজ তাই সত্যারোপ করবার জন্য জর্ম্মণী ছুটেছে। এ প্রসঙ্গে ইউরোপের অবশিষ্ট অংশে জর্ম্মণদের সংখ্যার একটা পরিমাপ দেওয়া যাক :—

হাঙ্গারীতে—২,০০০,০০০ হাঙ্গারীয়ান; ৫০০,০০০ জর্ম্মণ; ২৫০,০০০ শ্লোভাক; ৫০০,০০০ ইহুদী।

যুগোশ্লেভিয়া—১২,৫০০,০০০ দক্ষিণী শ্লাভ; ৫০০,০০০ জর্ম্মণ; ৫০০,০০০ হাঙ্গারীয়ান; ৫০০,০০০ এলবেনিয়ান; ৫০০,০০০ বুলগেরিয়ান।

রুমেনিয়া—১৪,০০০,০০০ রুমেনিয়ান; ২,০০০,০০০, হাঙ্গারিয়ান; ১,০০০,০০০ ইউক্রেনিয়ান; ১,০০০,০০০ ইহুদী; ৭৫০,০০০ জর্ম্মণ; ৫০০,০০০ বুলগার ও তুর্কী।

কাজেই দুর্দ্ধর্ষ জর্ম্মণ জাতের প্রতিনিধিরা যে সব জায়গায় বাস করছে বৃহত্তর জর্ম্মণীর অক্টোপাস সেখানেই নূতন প্রেরণায় হাত বাড়াবে। এরকম কোন নির্দ্দিষ্ট কৈফিয়ৎ গত যুদ্ধে জর্ম্মণীর ছিল না। বস্তুতঃ জর্ম্মণীর এই racial দৃষ্টি ইতিমধ্যেই এক রগড় ও হাস্যরস সৃষ্টি করেছে। খবর এসেছে জর্ম্মণী থেকে বেতার-ঘোষণা হয়েছে গান্ধীজী ইহুদীদের দলে—জর্ম্মণীর বিপক্ষে এবং সুভাষ বসু নাজিদের পক্ষে। এর মানে এখানে কেউ বোঝেনি। গান্ধীজীর নাসিকা ও মুখের ভঙ্গী ইহুদীর মত—সুভাষ বসুর সে রকম নয়। কাজেই ভারতবর্ষেও জর্ম্মণী হয়ত খুঁজছে আদিম জর্ম্মণ কেউ আছে কি না। ম্যাক্সমুলর এক সময় শর্ম্মণদের জর্ম্মণদের সগোত্র বলেছিলেন। সে রকম কোন theoryও জর্ম্মণী বা'র করবে পরে। এদিকে গান্ধীজী যতক্ষণ অস্ত্রোপচার করে' নাসিকার বঙ্কিমতা ঘুচিয়ে না দেন ততদিন আন্তর্জাতিক জগতে তাঁকে এই অসুবিধা ও দুর্নাম ভোগ করতে হবে।

এই সামরিক অগ্ন্যুৎপাতের ভিতর অন্য নূতন ব্যাপার হলো আধুনিক শাসনের নবারূপ। এর পরিচয় দেওয়া যাক :—

Germany
Italy
Spain
Portugal
} এদের শাসনপদ্ধতি হ'ল Authoritarian.

Poland
Rumania
Bulgaria
} Semi authoritarian.

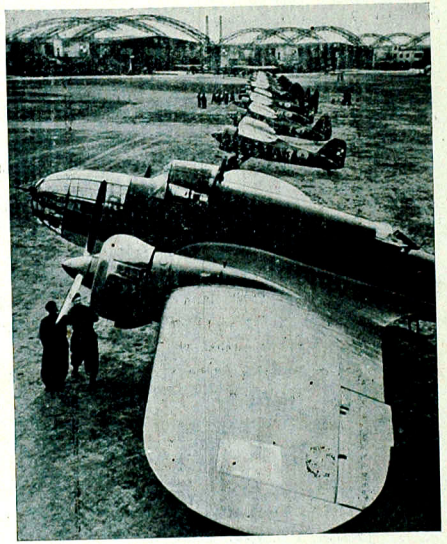

পোল্যাণ্ডের সবচেয়ে শক্তিশালী বম্বার

ইংলণ্ড
ফ্রান্স
Netherland
} Democracies [Coalition of Bourgeois Parties.]

হাঙ্গারী
যুগোশ্লাভিয়া
} Restriction of Democratic Rights.

সুইডেন ফিনল্যাণ্ড	Coalition of Bourgeois Parties and Socialists.
রুষিয়া—	সোভিয়েট
নরওয়ে—	Socialist Party Government.

এসব নমুনা হ'তে দেখা যায় একটা ভদ্র বিরোধের আয়োজন। নব্য আদর্শগুলি নানা জায়গায় সমন্বয় ও বিরোধের ভিতর দিয়ে নিজের 'বাঘনখ' লুকিয়ে রেখেছে। কাজেই একটা বোঝাপড়া ও সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য হয়ে পড়েছে এসব নূতন ভঙ্গী ও রূপের আহ্বানে।

এর ভিতর totalitarian রাষ্ট্র ইউরোপের ইতিহাসে একটা নূতন ব্যাপার। একে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড কতকটা ধূমকেতুর মতই দেখ্‌ছে। জর্ম্মণীর শ্রেষ্ঠতম রাষ্ট্রবিধিশাস্ত্রে দক্ষ Dr. William বলেন :—

"The Fuehrer now stands unchallenged as the supreme political leader of the people; supreme leader and highest superior for the administration, supreme judge of the people, supreme commander of the armed forces and the source of all law."

এই রকমের ক্ষমতা প্রাচ্যের সম্রাটেরাই এক সময় উপভোগ করতেন। জাপান সম্রাটের মৃত এঁর স্থান দেবতাস্থানীয়। এ রকমের অবতারের আবির্ভাব ইউরোপে কখনও হয়নি। কাজেই সঙ্ঘর্ষ অনিবার্য্য হয়েছে। 'Soviet' বিধান অপেক্ষাও এরকমের "দিল্লীশ্বরের মত জগদীশ্বর" সৃষ্টি বিপদসঙ্কুল। এ যেন পিরামিডের মত সৃষ্টি—সমগ্র রচনার উপর শীর্ষস্বরূপ একটি বিন্দু—চক্রের মত সমস্থলীতে কয়েকটি বিন্দুর যোগাযোগ নয়।

এর reaction বা প্রতিক্রিয়া ঘটেছে অস্ত্রশস্ত্রের আয়োজনে ও সৈন্য সমাবেশের বৈচিত্র্যে। সর্ব্বত্রই সাজ-সাজ রব উঠেছে—কিন্তু আয়োজন ও আদর্শের বিভিন্নতা তা'তে নানা ব্যতিক্রম নিয়ে এসেছে। নিম্ন তালিকায় ইউরোপের সমরায়োজনের দর্পণ পাওয়া যাবে :—

		Army	Navy টন	Airforce
ব্রিটেন	Regular	২০০,০০০		
	Territorial	২০০,০০০	১,৫০০,০০০	২৭৫০
	Reserve	১১৫,০০০		
ফ্রান্স	কলোনীসহ	৬৯২,৮৬০	৬৩৯,০০০	২৮০০
	রিজার্ভ	৩,৭০০,০০০		
জর্ম্মণী		৫৬০,০০০	১৭০,০০০	৫,০০০
	রিজার্ভ	৫,০০০,০০০		
ইতালী		৬০০,০০০	৬০০,০০০	২২০০
	রিজার্ভ	৩,৫০০,০০০		

	Army	Navy টন	Airforce
রাশিয়া	১,৩০৩,০০০		৪০০০
রিজার্ভ	১৩,০০০,০০০		

জল স্থল ও আকাশের যুদ্ধোপকরণের এই অসামঞ্জস্যও ইউরোপকে অস্থির করেছে। হিট্‌লারের হুকুমে যা সম্ভব হয়েছে, ডিমক্রেসীর ঢিমে তেতালায় তা সম্ভব হয়নি। ফলে এসেছে নূতন অবস্থাচক্র যা পরস্পরকে আঘাত না করে' স্বস্তি লাভ করতে পারবে না।

এর ভিতরকার Economic দিক আলোচনা করলে আরও বিস্মিত হ'তে হয়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনের Royal Air Force-এর জন্য ২০০,০০০,০০০ কুড়ি কোটি পাউণ্ড খরচ সাব্যস্ত হয়েছে। বস্তুতঃ সকল রাজ্যেই অসাধারণ খরচ করতে সকলে উৎসুক। বিশেষতঃ Democracy গুলি বিশেষভাবে এদিকে অগ্রসর হচ্ছে।

জর্ম্মণীতে ব্যবস্থা অন্যরকম। গভর্ণমেণ্ট national income-এর শতকরা ৪০ ভাগ গ্রহণ করে। এর মানে নাজি নেতাদের অর্থাভাব নেই।

এবারে নূতন আয়ুধের আবিষ্কারও যুদ্ধকে অনিবার্য্য করে' তুলেছে। আধুনিক পদাতিক-rifle ও Machine gun ছাড়া anti-tankgun ব্যবহার করে। Artillary '৭৬ ও '১০৭ শ্রেণীর কামান ব্যবহার করে—howitzer-এর আসন হচ্ছে '১২২ ও '১৫৩। তা ছাড়া এবার Motor Mechanised Corps ব্যবহৃত হচ্ছে। Mechanised tanks, Transport units or Parachutes, গোল Paint drum-এর মত "Depth charges", "Charge throwing Howitzers" প্রভৃতি এবারের কালান্তক অস্ত্র। Anti-Submarine Hammer প্রভৃতিও এযুগের উপাদান। এসব নূতন আয়ুধ নূতন বিশ্ববিজয়ের উৎসাহ জন্মদান করেছে সন্দেহ নেই।

বিজ্ঞান, মানুষ ও সমাজ

বিনয় ঘোষ

বিজ্ঞান মানুষের প্রয়াস। যেদিন জন্ম নিল সমাজ, সেদিন বিজ্ঞানও জন্ম নিল। বিজ্ঞানের সমাপ্তি নেই, কারণ মানবতার আয়ু অফুরন্ত। যুগের মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির রহস্যের অবগুণ্ঠন অনাবৃত করে' হয় যুগান্তকারী। যুগের পর যুগ মানুষ এইভাবে এগিয়ে চলেছে, চল্‌ছে, চল্‌বে;—নিত্য নব সমস্যার আবির্ভাবের সঙ্গে নূতনতর প্রতিভার উন্মেষ, শক্তির প্রকাশ, সমস্যায় আর শক্তিতে সংগ্রাম, সমস্যার প্রতিভূ প্রকৃতির পরাজয় আর শক্তির প্রতিভূ মানুষের জয়,—এই হ'ল মানুষের ইতিহাস, সমাজের ইতিহাস, সুতরাং বিজ্ঞানের ইতিহাস। গ্রাম্যগীতি গেয়ে লাঙল আর গরু নিয়ে আমরা আজ তাই ক্ষেত চষি না, আজ গেসোলিনে ট্র্যাক্টর চলে মাটির বুকে। তীর ধনুক নিয়ে বল্কল পরে' বনে জঙ্গলে আমরা আজ পশু শীকার করি না ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য, যন্ত্রে আমাদের খাবার তৈরী হয়, হাজার জনের খাবার কয়েক মিনিটে। গুহা ছেড়ে আজ যেখানে আমরা বাস করি তার স্বচ্ছ সরল আভিজাত্যে বিশ্বকর্ম্মাকে মাথা হেঁট করতে হবে। যন্ত্রে কাজ করে, আমরা পরিদর্শন করি। আমাদের এই যে কাহিনী, এই তো মানুষের ইতিহাস, মানুষের আর বিজ্ঞানের। অথচ নিখিলের (Universe) তুলনায় আমাদের এই পৃথিবীর আয়তন, আর পৃথিবীর তুলনায় আমাদের সভ্যার স্বাতন্ত্র্যের কথা ভাবতেও আমরা হতবাক্ হ'য়ে যাই। হবারই কথা। কয়েকটি মাত্র নক্ষত্রের বিষয় আমরা জানি, এ-পৃথিবীর চেয়ে সেগুলি সামান্য বড়, কিন্তু অধিক সংখ্যক নক্ষত্র এত বড় যে এ-পৃথিবীর মত লক্ষ পৃথিবীকে তাদের প্রত্যেকটির মধ্যে স্থান দিয়েও পূরণ হয় না, এবং এই শ্রেণীর নক্ষত্রের সংখ্যা এ-পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্র-কূলের বালুকণাসমষ্টির সমান। আমাদের আবাসগৃহ এ-পৃথিবীর সামান্যতা সহজেই অনুমেয়, আর আমাদের অর্থাৎ মানুষের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতাও সহজবোধ্য। সেজন্য নিখিলের অধীশ্বর দেবতার সুমুখে শ্রদ্ধানত শিরে এ-পৃথিবীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মানুষ অপরাধীর মত তার নগণ্যতার জন্য সঙ্কুচিত হবে না, বল্‌বে না এ-যুগের বৈজ্ঞানিক জীন্‌সের (James Jeans) মত যে এই নিখিলের শিল্পী হ'চ্ছেন একজন খাঁটি গণিতশাস্ত্রবিদ্, তিনশ' বছর আগে কেপ্‌লার (Kepler) যা বলে' গিয়েছিলেন—এ-পৃথিবী ঈশ্বরের সৃষ্টির আঙ্কিক ঐক্যের ও পরিপূর্ণতার প্রতীক—বল্‌বেনা এ-যুগের কবি এলিয়টের (T. S. Eliot) মত যে এ-পৃথিবীর মুখে আঁধারের ছায়া নামে, এ-পৃথিবী 'Waste and void', বল্‌বে না এ-যুগের রাজনীতিকদের মত 'ওঁ শান্তিঃ! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!' শান্তি নেই, সংগ্রাম আছে, আর সংগ্রামের জয়ে আছে সম্যাবস্থা। বিশ্রাম নেই, গতি আছে, দ্বন্দ্ব-মুখর গতি, বিকাশ যার সমন্বিত সভ্যতায়, পুনরায় আবর্ত্তনের আঘাতে যা দ্বিধাবিভক্ত ও গতিশীল। এই তো মানুষের কাহিনী, সমাজ ও সভ্যতার ক্রমাবর্ত্তন, বিজ্ঞানের ইতিকথা।

আরিস্ততল্ (Aristotle) থেকে স্কলাষ্টিক্ দর্শন আক্যুইনাস্, রোজার ও ফ্রান্সিস্ বেকন প্রভৃতির মাঝ দিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে' বিজ্ঞান ও দর্শনের বিসদৃশ সমাবেশ আমরা লক্ষ্য করলাম। বিজ্ঞানের বিস্তৃতি ক্রমেই সঙ্কুচিত হ'তে লাগল এবং বিজ্ঞান ও দর্শনের পারস্পরিক বিরোধও হ'য়ে উঠল তীব্রতর। দর্শনের ক্ষেত্রের সম্প্রসারণই হ'ছিল, কারণ মর্ত্ত্যলোকের প্রতিবেশে তখন তার বিরক্তির ভাব স্ফুটতর, অমর্ত্ত্যলোকে দেবতার পরিপার্শ্বে তার পরিতৃপ্তি। তারপর এল মধ্য-যুগের বিজ্ঞান ব্যবহারিক জীবনের পারিপাট্য নিয়ে। সে যুগের 'ক্যাপা' বৈজ্ঞানিকেরা হ'ল 'পরশ পাথরের' সন্ধানে উন্মাদ। নিকৃষ্ট ধাতুকে কেমনভাবে সোনাতে রূপান্তরিত করা যাবে তারই সাধনায় তাঁরা মগ্ন হ'লেন। অধ্যাত্মলোকের প্রহরীরা সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলেন,

আমরা যে খবরের কাগজ পড়ি, তার কাগজ তৈরী হয় বনজঙ্গল থেকে

খোদার উপর খোদগারীকে তাঁদের কাছে বৈজ্ঞানিকের অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা বলে' মনে হ'ল। তারপর এল রেণেসাঁস্-এর (Renaissance) যুগ। কয়েকটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হ'ল এবং বৈজ্ঞানিকও তাঁর অলীক সাধনমার্গ ছেড়ে বীক্ষণাগারে নিজের অগ্নিপরীক্ষার জন্য প্রবেশ করলেন। কক্ষঅবরুদ্ধ আত্মিক উল্লাস বর্জ্জন করে' দার্শনিকও বাইরের মুক্ত আলো বাতাসের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। দু'য়ের মধ্যে বিরোধ ক্রমেই ঘনীভূত হ'তে লাগল। নব নব শতাব্দীতে নব নব আবিষ্কৃত যন্ত্রের ভিড় জম্‌তে লাগল। পর্য্যবেক্ষণ ও ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রের বিস্তার গেল আশাতীতভাবে বেড়ে। তথ্যের প্রাচুর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রত্যয়ের ভিত্তি দৃঢ়তর হ'তে লাগল। অভিজাত কল্পনার বংশজাত দার্শনিক মুশ্‌ড়ে পড়লেন। পৃথিবী-সম্পর্কিত আদি অন্ত সমস্যার, অতীন্দ্রিয়তা ও আধ্যাত্মিকতার

সম্মোহিত 'চম্পার' দেশ থেকে দ্বীপান্তরিত হ'য়ে বিজ্ঞান ফিরে এল ভূমিতে, পর্য্যবেক্ষণবাদের (Empiricism) প্রাসাদ ধ্বসে' পড়ার শব্দ শোনা গেল। মানুষের মননশক্তি পর্য্যবেক্ষণের কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বন্দী হ'য়ে মুক্ত জীবনাস্বাদের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠল। আজ তাই বৈজ্ঞানিকের মনে সংশয় জেগেছে বিজ্ঞানের নির্দ্দিষ্ট আসন নিয়ে। সৌরজগতকে কেন্দ্র করে' যে বিশাল প্রশ্নসমষ্টি, অণু-পরমাণু থেকে সুরু করে' সংখ্যাতীত নীহারিকাপুঞ্জের মধ্যে যে অনন্ত অনুসন্ধিৎসার ধূম্রকুণ্ডলী তাকে মানুষিক বুদ্ধি দিয়ে অপসারিত করবার দাবীর মধ্যে বিজ্ঞানের দান কি—তাই নিয়ে বৈজ্ঞানিকের আজ বিপুল চিন্তা। বীক্ষণাগারের সূচীশ্রান্ত জীবনের ক্লিষ্ট আবহাওয়া তাঁদের কাছে অসহ হ'য়ে উঠেছে। পারিপার্শ্বিকতার মূল্য নির্দ্ধারণের যে হুকুম জারী হয়েছে তাতে তাঁরা ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছেন। প্ল্যাঙ্ক্ (Planck), জীন্স্ (Jeans), এডিংটন্ (Eddington), হোয়াইটহেড্ (Whitehead), লজ্ (Lodge), হ্যাল্ডেন্ (Haldane) প্রভৃতি এই ব্যাকুলতার প্রতীক। সরীসৃপের মত বিবেক আজ বৈজ্ঞানিকের মন বেষ্টন করে' নিষ্পেষণ করছে। বৈজ্ঞানিকের মধ্যে আজ দংশনোদ্যত বিবেক। সম্মুখে বিরাট প্রশ্ন—?

বিজ্ঞানের দু'টি দিক আছে এবং প্রত্যেকটি পরীক্ষার যোগ্য। একটিতে বৈজ্ঞানিকের স্বার্থ ব্যক্তি হিসাবে, অপরটিতে সমাজের সভ্য হিসাবে। একটিতে প্রকৃতির শক্তিগুলির অধ্যয়ন, পরীক্ষার ও বিশ্লেষণের নব পদ্ধতি আবিষ্কার এবং অধীত (Theoretical) ও ফলিতের (Practical) মধ্যে সামঞ্জস্যসাধন করে' সর্ব্বসাধারণের সম্মতিলাভ। অপরটির মধ্যে বিজ্ঞানের সামাজিক বিকাশের স্বীকৃতি আছে, সুতরাং সেই অনুপাতে তার ব্যাখ্যানও আবশ্যক। প্রথমটির উদ্দেশ্য নৈতিক বা ব্যক্তিক সংস্কার থেকে অধ্যয়নবস্তুর নির্মুক্তি কামনা হ'লেও দ্বিতীয়টির এর কবল থেকে নিষ্কৃতি নেই। সমাজে যতদিন নীতিগত ও সমাজগত স্তরবিন্যাস (Ideological and Social Stratification) থাকবে, ততদিন প্রত্যেকটি শ্রেণীর অন্তর্লীন ঐতিহ্যের প্রভাবদুষ্ট বিজ্ঞান হবেই। বিজ্ঞানের এই দু'টি দিকের একটি বৈজ্ঞানিক আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ব্যাপার, অর্থাৎ তার 'isolate'-দের সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত; অপরটি তার বাহিক সম্বন্ধের অর্থাৎ সমাজের বিন্যস্ত শ্রেণীগুলির প্রত্যেকটির সঙ্গে তার সম্বন্ধের ব্যাপার, যেখানে 'isolate' সে নিজেই। বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে প্রথম দিকটিতেই বিজ্ঞানের প্রগতি সম্ভব হয়েছে। জ্যোতিবিদ্যা ও যাদুবিদ্যা থেকে সুরু করে' ঐতিহ্য, ব্যবহার ও ব্যক্তি-সর্ব্বস্বতার ভিতর দিয়ে—বিজ্ঞান যত খাঁটি পরীক্ষার দিকে অগ্রসর হয়েছে, তত অভিজ্ঞতাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নের জন্য নির্দ্দিষ্ট 'criteria' আবির্ভূত হয়েছে। নিজেদের কর্ম্মফলের মধ্যে বৈজ্ঞানিকদের একতা দৃষ্ট হলেও, তাঁরা কিন্তু এক অদ্ভুত প্রহেলিকার পরিচয় দেন। অর্থাৎ বুঝতে হবে যে বিজ্ঞানের 'internal function' এবং তার সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মতদ্বৈততা আছে। সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকদের এই মতবিরোধিতা প্রণিধানযোগ্য।

অধ্যাপক হোয়াইটহেড্ (A. N. Whitehead) বলেছেন: "Our problem is to fit the world to our perceptions and not our perceptions to the world".

এখানে হোয়াইটহেড্ আদর্শবাদী। তাঁর নিজের প্রত্যক্ষতা তাঁর নিকট প্রধান সত্য এবং পৃথিবীকে তিনি তাঁর মধ্যে জুড়তে চান। হোয়াইটহেডের কাছে বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন হ'চ্ছে ব্যক্তিগত ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষতার (Sense perception) বিশ্লেষণ। স্বাধীন সম্বন্ধ-নির্ণয় করে এবং হোয়াইটহেড্ তাকেই বিজ্ঞান বলে' অভিহিত করেছেন। আর্থার এডিংটন্ (Arthur Eddington) বলেন: "Science aims at constructing a world that shall be *Symbolic* of the world of common-place experience." এ মতেরও তাঁর সঙ্গতি নেই। তিনি তাঁর "Nature of the physical world" আরম্ভ করেছেন তাঁর দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত টেব্‌লের সঙ্গে (Whitehead-এর ভাষায় 'Common-sense notion' টেব্‌ল)

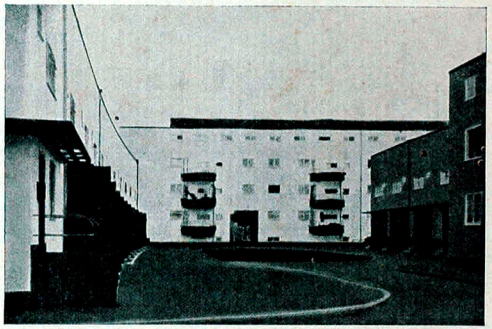

গুহা ছেড়ে আমরা আজকাল এখানে বাস করি

বৈজ্ঞানিক টেব্‌লের পার্থক্য দেখিয়ে। তাঁর দৈনন্দিন টেব্‌লে তিনি লেখেন, পড়েন, কিন্তু তাঁর বৈজ্ঞানিক টেব্‌লের বিশাল শূন্যতার মধ্যে অসংখ্য পরমাণু বিদ্যুৎবেগে ছুটোছুটি ক'রছে এবং যার "combined bulk amounts to less than a millionth part of the *table itself*." তাঁর মতামতের অসঙ্গতি তখনই পরিলক্ষিত হয় যখন তিনি পরে বলেন: "Modern physics has by delicate test and remorseless logic assured me that my second scientific table is the only one that is *really* there"—এবং এই সমস্ত সূক্ষ্ম পরীক্ষা যা তাঁর বৈজ্ঞানিক টেব্‌লের 'তত্রত্ব' (Thereness) প্রমাণ করছে অথচ দৈনন্দিন টেব্‌লের 'তত্রত্বে' বিশ্বাস করছে না, তাদের কোন উল্লেখই করেন না। আমাদের যতদূর মনে হয়

বৈজ্ঞানিকের এই প্রকার কোন 'সূক্ষ্ম পরীক্ষার' সুযোগ নেই। এই অবস্থায় "রূপক" (Symbolic) বৈজ্ঞানিক টেব্‌লকে দৈনন্দিন টেব্‌ল অপেক্ষা বেশী 'বাস্তব' ভাবার মধ্যে মনের যে অদ্ভুত কল্পনাক্রীড়া আছে তাতে আমাদের চিন্ত আদৌ সাড়া দেয় না। বের্ট্রাণ্ড রাসেল (Betrand Russell) বলেছেন যে চেতন বা অচেতনভাবেই হোক্ পদার্থ-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হ'চ্ছে পৃথিবীর কারণ-কাঠামো (Causal skeleton) আবিষ্কার করা। অন্যত্র তাঁর "The Analysis of Matter" নামক পুস্তকের মধ্যে তিনি বলেছেন: "It is obvious that a man who can see, knows things that a blind man cannot know; but a blind man can know the whole of physics. Thus the knowledge that other men have and he has not is not part of physics". এ-প্রশ্ন অবশ্যই অর্থহীন যে সমস্ত বিজ্ঞান বোঝা কোন ব্যক্তির পক্ষে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে সম্ভব কিনা। প্রশ্ন হ'তে পারে, তার জন্য কি কি ইন্দ্রিয়ের আবশ্যকতা আছে। যদি কোন ব্যক্তির কোন একটি ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয় বাস্তব জগতের সঙ্গে সংযোগের জন্য, তা হলে সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য একটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অপরটির পার্থক্য কিভাবে বিচার করব? মিঃ রাসেলের বক্তব্য হ'চ্ছে যে দৃশ্যমান্ জগত থেকে বৈজ্ঞানিক প্রতিচ্ছবির এককীকরণ (isolation) সম্ভব, তাতে কিছুই ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই। অধ্যাপক লেভী (H. Levy) বলেছেন: "This is surely an unsubstantiated assertion"—সূর্য্যের বর্ণালীর (Spectrum) মধ্যে একটি লাইন আছে যার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ১৫৯,০০০,০০০, সেন্টিমিটার, এ-কথা বললে অন্ধ যা বুঝবে তা শুধু ঐ সংখ্যা ও পরিমাপ। কিন্তু এই বোঝার সঙ্গে ঐ বর্ণালীর কমলারঙের (orange) অংশটুকু যে ঐ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের একটি লাইনদ্বারা অতিক্রান্ত, এ-বোঝার অনেক পার্থক্য আছে। দ্বিতীয় কথার মধ্যে পৃথিবীর যে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে তা অপরটিতে উপেক্ষিত হ'চ্ছে এবং এই দুই বোধের মধ্যে ব্যবধান আকাশ-মাটি। রাসেলের বক্তব্য সেইজন্যই গ্রহনীয় নয়।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও লেখকদের বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই সব হ'চ্ছে মতামত। এর মূল কারণের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। বৈজ্ঞানিকের অচলায়তনে পূর্ব্বদিকের কপাট আজ উন্মুক্ত। অধীত (Theoretical) বিজ্ঞান তার সীমান্তে এসে ভাবছে "তারপর"? ফলিত (Practical) বিজ্ঞানের এসেছে বিবেক-বুদ্ধিক দংশন। বাইরে যে সমাজ, মানবগোষ্ঠীর যে বৃহৎ সমাজ, তার সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্বন্ধ কি, আত্মীয়তা কিছু আছে কিনা এবং তা কি রকমের? বাইরের সমাজের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্বন্ধ-নির্ণয় করবার আহ্বান আজ বীক্ষণাগারের প্রশান্ত প্রতিবেশকে আলোড়িত করেছে। সামাজিক পটভূমির উপর নিজেকে প্রক্ষিপ্ত না করে' আজ আর বৈজ্ঞানিকের স্বস্তি নেই। কিছুদিন পূর্ব্বে ব্লাকপুলে বৃটিশ বৈজ্ঞানিকের এক সভায় এই সম্বন্ধ-নির্দ্দেশের যে প্রচেষ্টা হয়েছিল তাতে এই শুধু বোঝা গিয়েছিল যে বিজ্ঞানের প্রগতি সম্ভব হ'চ্ছে মানুষের প্রয়োজনকে স্বীকার করেই, সমাজজীবনের ভাবস্রোত বিজ্ঞানের পথ কেটে চলেছে সামনে এবং বিজ্ঞানের রূপ নিয়ন্ত্রিত হ'চ্ছে দেশ, কাল ও পাত্র সাপেক্ষ বস্তুর সমাবেশে। নিউটন্, ফ্যারাডে,

ম্যাক্সওয়েল্, পাস্তুর বা প্যাভ্‌লভ্ কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা না করলেও, এ-কথা অস্বীকার্য্য নয় যে সমসাময়িক রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, সমাজনীতি অথবা মানুষের ব্যবহারিক জগত এঁদের চিন্তাধারা ও কর্ম্মধারাকে অনেকখানি প্রভাবান্বিত করেছে। মানবকল্যাণের শুভেচ্ছাতেই চিরদিন বৈজ্ঞানিকের অন্তর অনুরণিত। বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যে মধ্যযুগীয় কল্পনা-বিলাসিতার পুনরাবির্ভাব তার কারণ বর্ত্তমান সমাজ ও ভাবী-সমাজ উভয় সম্পর্কেই তাঁদের নৈরাশ্য ও পরাভব-মনোবৃত্তি। কিন্তু বিজ্ঞান সম্বন্ধে বড় সত্য হ'চ্ছে এই যে, বিজ্ঞান সমাজ-জীবনের ফল এবং সমাজ-জীবনের কল্যাণসাধনই বিজ্ঞানের লক্ষ্য।

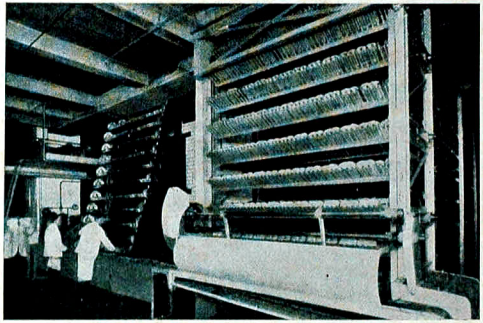

ওদেশের রোজকার খাবার। এই যন্ত্রে ঘণ্টায় প্রায় ৩০০০০ সের ওজনের রুটি তৈরী হয়

আজ লজ্ বল্‌ছেন (Oliver Lodge): "There is evidence of mind at work, beneficient and contriving mind, actuated by purpose,"—জীন্‌স্ বল্‌ছেন: "The universe begins to look more like a great thought than a great machine. The universe can be best pictured as consisting of pure thought of a mathematical thinker."—বার্গসঁ (Bergson) বল্‌ছেন "Elan vital" জীবনকে "more and more complex forms"-এর ভিতর দিয়ে "higher and higher *destinies*" -এতে নিয়ে যায়—এ সবের অর্থ কি? এঁরা এবং এঁদের অনুচরবৃন্দ বলবেন এই তো বিজ্ঞানী, প্রজ্ঞানের সঙ্গে যার অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তা, 'বিশ্বেশ্বর' যার সর্ব্বময় প্রভু। এখানে আবার বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজের প্রশ্ন আসে। এঁরা হ'চ্ছেন ধ্বংসোন্মুখ ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রতীক। সীমাহীন নৈরাশ্যের অন্ধকারের মধ্যে এঁরা দিক্‌ভ্রষ্ট হ'য়ে বিপজ্জনক ভাসমান্ 'আইসবার্গকে' আঁকড়ে

ধরতে চান। তাই আজ পৃথিবীর পশ্চাতে 'নিগূঢ় নিয়তি'র (Purpose) ব্যাখ্যা চল্ছে, পৃথিবী আজ তাই মনোহর অলস ভাবের (Thought) পর্য্যায়ে, 'Elan Vital', 'Supra-Conscious' প্রভৃতির অবতারণা। আজ তাই ধ্বংসোন্মুখ ধনতান্ত্রিক সমাজের জরিষ্ণু দুর্গন্ধি কলেবরের দিকে চেয়ে কবি (T. S. Eliot) বিলাপ করেছেন "Waste and Void. Waste and Void."—আর বৈজ্ঞানিক প্রাচীন প্রফেট্ ও পয়গম্বরের শূন্যাসনে বসে' ইষ্টনাম জপ্ করছেন। কিন্তু যেখানে এই মৃত্যুযন্ত্রণা নেই, এই নৈরাশ্য নেই, যেখানে সমাজের পচা-গলা আবর্জ্জনা পরিষ্কার হ'য়ে গিয়েছে, সেই সোশ্যালিষ্ট্ সোভিয়েট্ য়্যুনিয়নের বোল্‌শেভিক্‌দের নিয়ম হ'চ্ছে: "No one can be a member of the party or even a probationary......who does not wholeheartedly and outspokenly declare himself an atheist, and a complete denier of the existence of every form or kind of the supernatural." বোল্‌শেভিক্ রাশিয়ার বিজ্ঞান আজ আস্তিক্য প্রজ্ঞাসম্পন্ন না হ'য়ে কল্পলোকের পরমেশ্বরের শরণাপন্ন না হয়ে, নাস্তিক্যগন্ধী বিজ্ঞান হয়েছে, কারণ সেখানে শ্রেণী-শাসন (class rule) বা শ্রেণী-শোষণ (class exploitation) নেই, ক্ষয়িষ্ণু সমাজগর্ভজাত অবসাদের সোঁদা গন্ধ নেই, বর্দ্ধিষ্ণু সোশ্যালিষ্ট্ সমাজের অপূর্ব্ব লাবণ্য আছে। সেখানকার বৈজ্ঞানিকের একমাত্র সত্য মানুষ ও সমাজ, তার উপরে কোন কিছুর অস্তিত্বে আস্থা নেই। সেখানকার কবি তাই গান গায়:

> "Comrades,
> To the barricades!
> The barricades of hearts and souls!
> True Communists,
> burn their bridges of retreat.
> *   *   *   *
> Drum,
> or grand wide open,
> noise anyway,
> and thunder.
> *   *   *   *
> Enough of ha'penny truths,
> erase the past from your heart!"
>
> (*Vladimir Mayakovsky*)

—সেখানকার বৈজ্ঞানিকের লক্ষ্য তাই প্রাচুর্য্য ও আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রী, বৈরীভাব বা তস্করপ্রবৃত্তির আবিলস্পর্শ নেই। সমাজ যেদিন শ্রেণীমুক্ত হবে, অত্যাচার, নিপীড়ন, শোষণ, যেদিন বিলুপ্ত হবে, সেদিন বিজ্ঞান মুক্তকণ্ঠে তার আদর্শের জয়গান গেয়ে মানুষকে নিঃসঙ্কোচে আহ্বান করবে। তাই বৈজ্ঞানিকের নিরাশায় আমরা বিজ্ঞানের উপর শ্রদ্ধা বা আশা ত্যাগ করি নি। বিজ্ঞান চিরদিনই মানুষের সামনে শঙ্খধ্বনি করে' এগিয়ে যাবে, সমতালে অনুগামী হবে মানুষ ও মানুষের সমাজ। বৈজ্ঞানিক চিরদিন মানুষের নমস্য থাকবেন সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষী বলে'।

ঝড়ের আকাশ

বিশ্বনাথ চৌধুরী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

জীবনের একটা ইতিহাস আছে, গড়ে' ওঠবার ইতিহাস। একটা কিছু হয়ে ওঠো পৃথিবীর প্রয়োজনে নয়, নিজের সুগভীর আত্মচেতনায়। পৃথিবী কত ক্ষুদ্র, কত সঙ্কীর্ণ আর সীমাবদ্ধ, সব-কিছুকে পার হয়ে যাও দূরে, আরও দূরে, দূরের অস্পষ্টতায় উন্মাদ গতিবেগ সংহত কোরো না। জীবনকে পেতে হ'লে জীবনকে পার হ'য়ে যেতে হবে রুদ্ধশ্বাস গতিতে, সুন্দরের সম্ভাবনায়। মানুষের অপরিমিত দুঃখ পৃথিবীর তিন ভাগ জলের মত, তবু দুঃখই ঐশ্বর্য্যের অগ্রদূত, আঘাতেই জীবনের পরিপূর্ণতা—এসব কথা কৃষ্ণা কতবার করে' ভেবেছে। জীবনকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার জন্যে এই ত মনে মনে সে আবৃত্তি করে আজকাল; যদি একটু সাহস পাওয়া যায়—বাঁচবার জন্যে সাহস। কিন্তু তার আর সাহস নেই—সে চায় স্তব্ধতা, মৃত্যুর মত শান্ত শীতল স্তব্ধতা। প্রতিদিন তার ঘুমের মধ্যে শেষ হোক—মৃত্যুর মত গভীর ঘুম। ঘুমের অন্ধকারে সে আর জাগ্‌তে চায় না—সাহস নেই তার।

কি হয়? সমস্ত চেতনাকে একাগ্র করে' সূর্য্যালোক দেখ্‌বার উন্মাদ প্রতীক্ষা করে' কি হয়? তার মা কি পেরেছেন? অন্ধতার-দেয়ালে-ঘেরা জীবনের প্রতিটিদিন শ্বাসরোধের যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট। তার মায়ের জীবনে আলোছায়ার দোলা লাগেনি, বর্ষণের পর ইন্দ্রধনুও নয়, অথচ কৃষ্ণা ভাবলে আশ্চর্য্য হ'য়ে যায়, কী ঐকান্তিক সেবা আর পরিশ্রমে তিনি প্রতিটি মুহূর্ত্ত মধুর করে' তুল্‌তে চাইতেন, কত বাধা তিনি অতিক্রম করে' যেতেন, অন্ধকারকে ঠেলে-ঠেলে পথ করার চেষ্টা কর্‌তেন।

স্বামীর জীবনে ছিল প্রচুর অপব্যয়, তিনি শাসনে আনবার চেষ্টা কর্‌তেন। তাঁর আশা ছিল সাধনায় তাঁকে খুসি করে' জীবনের অজস্রতা তিনি বাড়িয়ে তুল্‌বেন।—উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ক্লেদ আর গ্লানি আর তাঁকে স্পর্শ কর্‌তে না পারে—সেই চিন্তায় কত-কিছু সম্ভব-অসম্ভব পরিকল্পনা যে তাঁকে কর্‌তে হ'তো, কৃষ্ণার সে-সব কথা মনে হ'লেও হাসি পায়। অথচ এই মহিলাটি শেষ নিঃশ্বাস ফেলার সময়ও কত সাধ আর কামনা নিয়ে গেছেন—স্বামীর ওপর অবিচলিত শ্রদ্ধায় শেষবারের জন্য ফটোখানা বুকের ওপর চেপে ধরেছেন—প্রতীক্ষা-চঞ্চল আর্দ্র দু'টি চোখে কত কাতর অনুনয়—সূর্য্য আর আকাশ দেখবার প্রতীক্ষায় ক্লান্ত দু'টি চোখ।

মায়ের মৃত্যুর পর ছোট ভাই নানুকে নিয়ে সে কী বিপদেই না পড়েছিল। সব সময় কান্নায় ক্লান্ত একটী শিশুকে আড়াল করে' রাখা—সাত বছরের ছেলে কিছুতেই থামতে চায় না—সব সময় সেই এক প্রশ্ন 'মা কোথায় দিদি?'

যদি বলা যায় হাসপাতালে, অমনি দেখতে যাবার বায়না ধরে—'নিয়ে চলো দিদি শিগ্‌গির।' কৃষ্ণা এক হাতে চোখ্‌টা মুছে তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলে, 'জানিস্, স্বর্গ বলে' একটা দেশ আছে—আমরাও যাবো সেখানে।'

অবোধ নান্‌কু আরও অস্থির হ'য়ে ওঠে। স্বর্গ দেশটার দূরত্ব জেনে নিয়ে তখনই তার রওনা হ'বার ইচ্ছা। কৃষ্ণা আর পারে না—ভাইকে কোলের কাছে বসিয়ে বিশৃঙ্খল চুলগুলো পরিপাটী করে' দেয়, সাবানে-কাচা অল্প পরিস্কার একটা জামা পরিয়ে দিয়ে বলে 'তুমি স্কুলে যাবে না নান্‌কু? জানো, আজ তোমাদের স্কুলে কেমন সুন্দর ম্যাজিক হবে?'

ম্যাজিকের কথায় নান্‌কু মুহূর্ত্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়—কিসের যেন স্বপ্ন তার ছু'চোখ ছেয়ে নেমে আসে, কত রঙ আর খেলা—লাল রঙ মুহূর্ত্তে নীল হ'য়ে যায় আবার নীল রঙ লাল হ'য়ে ওঠে। আলাদিনের স্বপ্নের মত এক মুহূর্ত্তে আম গাছ গজিয়ে উঠে পাকা আম ঝুলতে থাকে।—নান্‌কুর বেশ মনে আছে, আরবছর একটা ছেলে চিনি মনে করে' কেমন অনেকখানি নুন খেয়ে ফেলেছিল।

নান্‌কুর শিশুমন কৌতুকে মেতে ওঠে, কোমরে কাপড় জড়াতে-জড়াতে বলে, 'কাল কিন্তু মায়ের কাছে যাবো দিদি।'

কৃষ্ণা অশ্রুসিক্ত মুখখানা হাসিতে প্রফুল্ল করার চেষ্টা করে' বলে, 'বেশ, তাই যেও।'

ঘুমের মধ্যে নান্‌কু আবার কেঁদে ওঠে, সে-কান্না আর কিছুতে থামতে চায় না—রাত্রির অন্ধকারে একাগ্র দৃষ্টি মেলে নান্‌কু যেন মায়ের শীতল কঠিন মুখখানা দেখ্‌বার আশায় জেগে বসে' থাকে,—কৃষ্ণার কত আদর, গল্প বলে' ভুলিয়ে রাখার কত চেষ্টা শেষে সব একাকার হ'য়ে যায়। কৃষ্ণার চোখের জল ঠোঁটে এসে নামে—কৃষ্ণা আর পারে না।

'বোতলগুলো বাইরে বের করে' দিলাম বাবা, ও ছাই ভস্ম তোমার যেখানে-খুসি রেখো, কিন্তু এখানে নয়—এ ঘর আজ থেকে আর অশুচি করা চলবে না।' কথাগুলো শুষ্ক, আবেগ-হীন, আর উচ্চারণের দৃঢ়তায় এমন চাপা কঠিন নির্ম্মমতা ছিল যে এক টুক্‌রো পাথরের মত তা ঘরের বাতাসকে ধাক্কা দিয়ে গেল। কথাগুলো বলতে পেরে কৃষ্ণা অনেকখানি হাল্কা হ'লো। এতদিন যা অনুচ্চারিত ছিল, তার উচ্চারণ হ'লো। এই বেশ হলো, কৃষ্ণা মনে মনে ভাব্‌লে।

শ্যামানাথ গম্ভীরমুখে কড়া দেশী তামাক পুড়িয়ে নিঃশেষ করছেন, তারই উৎকট গন্ধে ঘরের বাতাস ভারাক্রান্ত। কৃষ্ণা সেখান থেকে উঠে মায়ের ঘরে এসে দাঁড়াল—নিখুঁত পরিচর্য্যায় পরিচ্ছন্ন প্রত্যেকটি জিনিষ। কেরোসিন কাঠের টেবিলে খানকয়েক বাংলা বই। স্কুলের লাইব্রেরীর জন্যে তার মা এই প্রথম বই কেনেন। নিজের হাতে গড়ে' তোলা এই স্কুল, সংসারের পঙ্কিল স্রোত পার হ'য়ে এখানে এসে তিনি খুসিমতো বিশ্রাম করতেন আর স্বপ্ন দেখতেন।

নির্ম্মম কঠিন বাস্তব,—একটু রঙ চাই। খানিকটা আকাশ আর অনেকখানি স্বপ্ন। কৃষ্ণা তার মাকে অনেকবার একথা বল্‌তে শুনেছে, অনেকবার—যখন তিনি আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত আর ক্লান্তিতে অবসন্ন হ'য়ে পড়েছেন।

নান্‌কুর এখনও ঘুম ভাঙেনি। এই ত একটু আগে কৃষ্ণা বিছানা ছেড়ে উঠে এল—কতক্ষণ চুপ করে' থাকা যায়, ঘুমেরও একটা শেষ আছে যেটা ঘুমের চেয়েও ভাল লাগে—আচ্ছন্ন স্নায়ুগুলোর উপর অলস আরামের স্পর্শ—কিন্তু ও-টাও একটা বিলাস—বিলাসিতা কৃষ্ণার সহ্য হয় না।

শ্যামানাথের কাসির শব্দে কৃষ্ণাকে উঠ্‌তে হ'য়েছে। রোজই শেষ রাতে চোখ থেকে ঘুম ধুয়ে-মুছে ফেলে সে উঠে বসে। রান্নাঘরের একদিকের বেড়া একরকম খসে' পড়েছে—তারই খানিকটা টেনে নিয়ে কৃষ্ণা আগুন ধরায়। গরমজলে বুক গরম করে' না নিলে শ্যামানাথের শ্বাসকষ্ট থামতে চায় না। এক একবার কাসির বেগে দম বন্ধ হ'য়ে আস্‌বে মনে হয়—বুকের পাঁজরা ক'খানা চামড়ার আবরণ ভেদ করে' ঠেলে বেরিয়ে আসে।—শ্যামানাথের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হয়ে আসে, অনেক কষ্টে সে কৃষ্ণাকে কাছে ডাকে।

কন্যার একটু করুণা হয়,—হয়ত দুর্ব্বল পিতার সমস্ত অপরাধ সে মনে মনে ক্ষমা করতে চেষ্টা করে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার অস্থির হয়ে ওঠে, তার বিদ্রোহী মনকে কিছুতেই সে শাসনে আনতে পারে না।

শুষ্ক পাণ্ডুর ঠোঁটটা একটু নড়ে' উঠলো, কৃষ্ণা ঘরের ভিতর পায়চারি করতে করতে কি যেন ভাব্‌লে, তারপর সোজা শ্যামানাথের সাম্‌নে এসে দাঁড়াল—সমস্ত মুখে একটা উত্তেজনার চিহ্ন পরিস্ফুট; বল্‌লে, 'স্কুলের ফার্নিচার আর একটাও পাওয়া যাচ্ছে না, কোথায় গেল বল্‌তে পারো?'

বোকার মতো সাম্‌নের দাঁত দুটো বের করে' শ্যামানাথ একটু হাসির চেষ্টা করলে, 'আমি বলিনি তোকে—ফম্বু স্যাক্‌রার দু'দুটো ছাগল দিনে-দুপুরেই সাবাড় করে' দিলে—চোর নয়, ডাকাত। এ রকম অনাসৃষ্টি এর আগে কোনদিন শুনিনি বাপু।'

'আমিও এর আগে শুনিনি বাবা,—কিন্তু চুরিটা দিনে নয় রাত্রিতেই হয়েছে দেখা গেল।' কৃষ্ণার দৃষ্টিতে আগুনের ঝাঁজ।

ললাটের লোল চর্ম্মকে অনেকখানি কুঞ্চিত করে' শ্যামানাথ বল্‌লে, 'তুই কি জানিস নাকি? কই বলিস্‌নি ত আমায়?'

'দরকার নেই বলে'।' কৃষ্ণা জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল।

'দরকার নেই কি রকম? নিশ্চয় আছে—পুলিসে খবর দিতে হবে না?—'

কৃষ্ণা অনেকক্ষণ চুপ করে' ছিল হঠাৎ অস্থির কণ্ঠে বলে' উঠলো, 'মিথ্যেকে ঢাক্‌তে গিয়ে আর ক'টা মিথ্যে বল্‌বে? কিন্তু এর কোন প্রয়োজন ছিল না।'—ঝড়ের বেগে কৃষ্ণা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো, সমস্ত মন তার বিষাক্ত বাষ্পে ভরে' গেছে।

তারপর কয়েক বছরের সেতু পার হ'য়ে অনেক রৌদ্রতাপে দগ্ধ হ'য়ে অনেক হাহাকার-করা বসন্তের দীর্ঘশ্বাস বুকে নিয়ে কৃষ্ণা নাগরিক জীবনে প্রবেশ করেছে। তার আগে

নানকু আশ্রয় পেয়েছে একটা মিশনে—আর কৃষ্ণা ম্যাট্রিক পাশ করেছে প্রাইভেটে। শ্যামানাথকে বাদ দিয়েই তাদের সংসার, সুতরাং সে-বিষয়ে কৃষ্ণা কোন আগ্রহ প্রকাশ করেনি।

হস্টেলের অপরিচিত আবহাওয়ায় এসে কৃষ্ণা গত জীবনের কয়েকটা পাতা উল্টে দেখ্‌লে—কিছুই তার ভাল লাগছে না, কোন-কিছুতেই যেন উৎসাহ নেই। তবু জীবনের একটা ইতিহাস আছে, গড়ে' ওঠবার ইতিহাস—একটা কিছু হ'য়ে ওঠা'—কৃষ্ণা মনে মনে একবার হাস্‌লে।

সমস্ত দিনেও সে কোন-কিছু গুছিয়ে নিতে পারেনি। দুঃস্বপ্নে আর দুশ্চিন্তায় ভারাক্রান্ত তার মন। শুয়ে শুয়ে এলোমেলো অনেক কথা নিয়ে সে নাড়াচাড়া করেছে, কোন কিছুতেই উৎসাহ নেই তার। এর মধ্যে এক দল মেয়ে কলেজে গেছে, এক দল ফিরেছে—আর একদল গেছে সিনেমায়। কৃষ্ণা এইবার উঠে বস্‌লো। বেলা শেষ হ'লো বোধ হয়—জানালাটা সে খুলে দিলে। একরাশ জামা-কাপড়ের আড়াল থেকে মায়ের ছবিটা বের কর্‌লে। অনেক দিন পরে আবার তার দু'চোখ ভরে' জল এলো—তার মায়ের কুমারী-জীবনের ছবি—কোন এক শিল্পীর আঁকা।

কৃষ্ণা জান্‌তো সকলের দৃষ্টির আড়ালে কতদিন তার মা এই ছবিখানা হাতে নিয়ে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছেন।

পশ্চিমের আকাশে মেঘের স্তরে-স্তরে অনেক খেলা চলছে। কৃষ্ণা অন্যমনস্কভাবে সেই দিকে চেয়েছিল। বাতাসে উড়ে এলো একটা ঝরা পালক—সেইটা হাতে নিয়ে সে নীচে নেমে এলো।

হস্টেলের দারোয়ান এর আগে একটা স্লিপ দিয়ে গেছে। কৃষ্ণা ভিজিটিং রুমে এলো। চেয়ার টেনে বসে' আগন্তুকের মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো—তারপর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বল্‌লে, 'কি চাই আপনার?'

একমুখ দাড়ি নিয়ে সুবিমল এমনিই বিব্রত হ'য়ে পড়েছিল—কৃষ্ণার ধারালো দৃষ্টির সাম্‌নে আরও সে মুসড়ে গেল—দুর্বল কণ্ঠে বল্‌লে, 'না, এমন কিছুই নয়—মানে আমি জান্‌তাম না। কথাটা অসমাপ্ত রয়ে গেল।

কৃষ্ণা প্রশ্ন কর্‌লে, 'কি জান্‌তেন না?'

'আপনি যে ওদের বাড়ী ছেড়ে এসেছেন, মানে রমলারা আমাকে বলেনি এর আগে।'

'আপনি বুঝি তাই জান্‌তে গিয়েছিলেন?' কঠিন গলায় কৃষ্ণা বল্‌লে।

'না না, তা কেন? আমি ত এমনিই যাই সেখানে, মানে—'

'অনেক মানে শুনেছি, এখন আপনার এখানে আসার মানে কি বলুন তো?'

কৃষ্ণার কথায় সুবিমল রীতিমত বিপর্য্যস্ত হ'য়ে পড়েছিল। অনেকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কোন কথা বা'র হ'লো না। হাতের ছাতাটা মেঝেতে পড়্‌লো—সুবিমল বল্‌লে, 'আপনি রাগ করেছেন? আমি বুঝ্‌তে পারিনি, মানে—'

'কোনদিন পার্‌বেন বলে' মনে হয় না।' তারপর একটু থেমে বল্‌লে, 'কিছু বল্‌বেন আমাকে?'

সুবিমলের চোখ দু'টো ছোট হ'য়ে এলো—আর্দ্রকণ্ঠে বল্‌লে, 'না, কি আর বলবো, বলার কি আছে?'

'তবে চলি।' কৃষ্ণা উঠে দাঁড়াল।

সুবিমল থতমতভাবে বললে, 'একটু বস্‌বেন না?'

'কেন বলুন তো?' কৃষ্ণা আবার নিজের চেয়ারে ফিরে এলো।

'চুপ করে' বসে' থাকতে ভাল লাগে, মানে—'

'আপনি কি আমার মান রাখ্‌বেন? অনেক মানেতে মান হানি হয় জানেন তো।'

সুবিমল বোকার মত হাসলে—একটা শব্দ শুনে সে উঠে দাঁড়াল। কৃষ্ণা বারান্দার দিকে এগিয়ে এসে বললে, 'এ কি? তুমি এখানে—কতক্ষণ এমনি চুপ করে' বসে' আছ?' কৃষ্ণার গলায় আর ঝাঁজ নেই, যেন অন্য কেউ কথা বলছে।

অন্যদিকে চেয়ে জয়ন্ত বললে, 'তোমাদের কথা শেষ হ'লো?'

'কথাই ছিল না তার শেষ হবে কি?' কৃষ্ণা ভুরু কুঁচ্‌কে বললে।

'তবে এতক্ষণ কি হলো?'

'কথা না বলার ভূমিকা।' কৃষ্ণা বল্‌লে।

জয়ন্ত যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। কৃষ্ণা স্কন্ধদেশের একটি সুন্দর ভঙ্গী করে' বললে, 'পাঁচ মিনিট।' কিন্তু তার আগেই কৃষ্ণা প্রস্তুত হ'য়ে এলো। দু'জনেই সিঁড়ি দিয়ে নামছে—সুবিমল এসে সামনে দাঁড়াল।

কৃষ্ণা বল্‌লে 'আপনি সেই থেকে বসে' আছেন?'

সুবিমল নার্ভাস হ'য়ে বললে, 'চলেই ত যাচ্ছিলাম—মানে আপনার সঙ্গে শেষে একবার—'

কৃষ্ণা অসমাপ্ত কথাটা টেনে নিয়ে বললে 'দেখা করে' যেতে চান।—এই ত দেখলেন। নমস্কার, আসুন তাহ'লে।' কোনদিকে না তাকিয়ে কৃষ্ণা রাস্তায় নেমে এলো। জয়ন্ত বললে, 'নির্ম্মমতা মেয়েদের মানায় না।

'আশা করি তুমি আমাকে লক্ষ্য করেই বলছো।' কৃষ্ণা একটু গম্ভীর গলায় বল্‌লে।

'আমার কোন উক্তিই ব্যক্তিগত নয়।' জয়ন্ত একটু হেসে কথাটা শেষ করলে। তারপর একটু থেমে প্রশ্ন করলে, 'কিন্তু ঐ ভদ্র লোকটি কে?'

কৃষ্ণার এখন কথা বল্‌তে ভাল লাগছে। সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর এই যেন তার কথা বলা আরম্ভ হ'লো। বল্‌লে, 'রমলাদের বাড়ী ওকে প্রায়ই দেখ্‌তাম। ওদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। মাসিমার ওর সম্বন্ধে একটু পক্ষপাতিত্ব ছিল। একদিন রমলার কাছে শুনলাম, মনে মনে তিনি পরোপকারিতার একটি গোপন ইচ্ছাও পোষণ করেন, যদিও তিনি তা আমার কাছে ব্যক্ত করেন নি। তবুও, সেই থেকেই লোকটাকে আরও বিশ্রী লাগতে লাগ্‌লো।' একটু থেমে

কৃষ্ণা আবার বল্‌লে, 'কিন্তু তুমি শুনলে বিস্মিত হবে, লোকটা এমনি নিরেট, কিছুতেই সে-কথা বুঝতে পারে না—মাঝে মাঝে এমন বিরক্ত করে!'

'তুমি ভুল করছো কৃষ্ণা,, হয়ত তোমার ধৈর্য্যের উপর ও বিশ্বাস করে' বসে' আছে—ও জানে তোমার এ বিরক্তি চিরদিন থাকবে না, একদিন সব সহ্য হয়ে যাবে।'

'তুমি একটু চুপ করবে?'

'তুমি বল্‌লেই করবো। প্রসঙ্গটা তোমারই ব্যক্তিগত।' একটা বাসে উঠে জয়ন্ত সিগারেট ধরালে।

কৃষ্ণা বল্‌লে, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'তা জানবার দরকার নেই, কারণ, কলকাতা পৃথিবীর মত বিস্তৃত নয়—পথ যেখানেই শেষ হোক্ ফিরবার পথ আমাদের থাকবে।'

'কিন্তু আমাদের সময়ও ত দীর্ঘ নয়। সময়ের শেষ হবার আগেই আমাদের ফিরে আসতে হবে—' কৃষ্ণা অন্যদিকে চেয়ে বল্‌লে।

'সে ভয় তোমার নেই—তোমার হস্‌টেলের দরজা বন্ধ হ'লেও আমার দরজা খোলা থাকবে।'

'তোমার আজ কী হ'য়েছে বলো ত? এত উচ্ছ্বাস—এত প্রাচুর্য্য!'

'সহ্য হচ্ছে না, নয়?'

'তা নয়, তবু কেমন যেন ভয় লাগে।' বাস থেকে নেমে ওরা মাঠের দিকে এলো।

'তার মানে—তুমি আমার মধ্যে একটি দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের স্খলন আশঙ্কা করছো?' একটু থেমে জয়ন্ত আবার বল্‌লে, 'তুমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারো কৃষ্ণা, কোন মেয়েকে নিয়ে তেমন আগ্রহ আমার নেই।'

সময়ের নিস্তব্ধ সমুদ্রে কয়েক টুক্‌রো কথা তলিয়ে যাচ্ছে, ওরা দেখ্‌তে পেল। কৃষ্ণা বল্‌লে, 'নির্ম্মমতা পুরুষদের সুন্দর মানায়।'

'তোমার দুর্ব্বল মুহূর্ত্ত—' জয়ন্ত বল্‌লে।

'এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের রঙ্ আর রেখায় রচিত হ'য়েছে পৃথিবীর কাব্য, এ-দুর্ব্বলতা আমার অহঙ্কার জয়ন্ত।'

'তোমার দুঃসাহস আছে কৃষ্ণা—' একটু থেমে জয়ন্ত যোগ করলে, 'কথা বলার দুঃসাহস।'

'তুমি কি তা আশা করোনি?' কৃষ্ণা ভীরু মেয়ের মত জয়ন্তর মুখের দিকে তাকাল ...আলোর স্রোত পার হ'য়ে ওরা একটু অন্ধকারে এলো।

ভিজে ঘাসের ওপর বসে' জয়ন্ত বল্‌লে, 'ইউনিভার্সিটিতে তোমায় যখন প্রথম দেখি—কী এক রহস্য তোমার চারপাশে ঘুরে বেড়াতো। এখনও আমার বেশ লাগে সেদিনের কথা ভাব্‌তে। রহস্যের অতলে তোমার স্বপ্ন—' জয়ন্ত একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে গেল।

'অনেক পুরোনো হ'য়ে গেছি নয়? ব্যবহারে মানুষ পুরোনো হ'য়ে যায়। তবু আশ্চর্য্য, মানুষ তাই কামনা করে, কাছে আসতে তাই ভাল লাগে। মনে পড়ে আমাদের প্রথম দিনের পরিচয়, কত সংক্ষিপ্ত অথচ যেন শেষ নেই—সমস্ত জীবনেও যেন শেষ হ'বার নয়!'

একটি গুপ্ত কবিতা।

জয়ন্ত বল্‌লে, 'লাইব্রেরী থেকে তুমি চলে' গেলে, খাতাটা টেবিলের ওপর পড়ে' রইলো—স্পর্শের আগ্রহে উন্মুখ আমার আঙুলে তোমার অক্ষরগুলো বন্দী হ'য়ে রইলো কিছুক্ষণ।'

'ফিরিয়ে দেবার সময় কী রকম নার্ভাস হয়েছিলে!—একটা কথাও মুখে এলো না তোমার—'

'অনেক কথার ভিড়ে সব কথা হারিয়ে গেল—কোন-কিছুই বলা হ'লো না।'

'কিন্তু তোমার কবিতা পড়লাম—অনেকরাতে ঘুমের মধ্যেও আমাকে নাড়া দিয়ে গেল। অন্ধকার হ'লো রোমাঞ্চিত—আবার সূর্য্যকে দেখতে পেলাম।'

দূরে জনতার কোলাহল,—সহরে নির্জ্জনতা নেই।

জয়ন্ত বল্‌লে, 'তোমার চিঠি পেয়ে ভেবেছিলাম—ডাক এলো। অদ্ভুত তুমি। কোন-কিছু খুলে লেখোনি অথচ চিঠি পড়ে' এক মুহূর্ত্ত নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। তোমার মাসিমার সম্বন্ধে আমার ভয় ছিল, কিন্তু তোমাকে নিয়ে আমার দুর্ভাবনা আরম্ভ হ'লো। হঠাৎ কেন চলে এলে বলো ত?'

কৃষ্ণা সে-কথার উত্তর না দিয়ে বল্‌লে, 'চলো, এইবার ফিরি।'

'কিন্তু আমার কথার ত উত্তর দিলে না।'

'অনেক কথার উত্তর দেওয়া চলে না।'

'তার মানে তুমি বলতে চাও না?'

'তার মানে তুমি জানতে চেয়ো না।' কৃষ্ণা বল্‌লে।

'কিন্তু আমি জানি, মাসিমা একদিন ডেকে পাঠিয়েছিলেন আমায়।'

'তুমি গিয়েছিলে সেখানে?' কৃষ্ণা ভীত কণ্ঠে বল্‌লে।

'গিয়েছিলাম বলেই জানা সম্ভব হ'লো।'

'কেন তুমি সেখানে গেলে জয়ন্ত?' কৃষ্ণা উত্তেজিত হয়ে বল্‌লে, 'তুমি জানো না ওরা কি?' তুমি জানো না—' কৃষ্ণা কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়্‌লো।

বাসে উঠে কেউই কোন কথা বললে না। ওয়েলিংটন পার হতেই জয়ন্ত বল্‌লে, 'আমি আর যাবো না কৃষ্ণা, অনেক রাত হয়েছে।'

কৃষ্ণার বোধ হয় সে-কথা কানে গেল না, একবার এদিকে সে ফিরেও তাকালে না।

ক্রমশঃ

আশাপূর্ণা দেবী
৭৭, বেলতলা রোড, কলিকাতা

সাহিত্য ও বাস্তব

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

এখনকার সাহিত্যে বাস্তবকে এত বেশী প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে যে যা সচরাচর সুলভ নয়, যাকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায় না, তাকে অসত্য বলে', অপ্রয়োজনীয় বলে' বর্জ্জন করা হচ্ছে। আগেকার আমলে বলা হ'ত, যা প্রত্যক্ষ যা প্রাত্যহিক, তা ত চোখের ওপরই রয়েছে—উঠতে বসতে প্রতি-পদেই ত তাকে আমরা দেখছি শুনছি, তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে অনুভব করছি—শিল্পে এবং সাহিত্যে আবার তাদেরই আবির্ভাব কি দরকার? বরং এই প্রত্যক্ষতা বা বাস্তবতার অতিমাত্রিক অত্যাচার থেকে ক্ষণিক মুক্তি পাওয়াই ছিল প্রাচীনদের মতে আর্টের পরম প্রসাদ। এই মতের পোষকতা করতেই তাঁরা আর্টের সংজ্ঞা নির্দ্দেশের সময় রসকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

তাঁরা বলতেন, বাস্তবকে আশ্রয় করেই আর্ট সৃষ্ট হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সৃষ্টি হয়ে যাবার পর তার এমনভাবেই রূপান্তর ও জাত্যান্তর হয়ে যাবে যে তখন আর তাকে বাস্তবের প্রতিরূপ বলে' মনে করা চলবে না। অর্থাৎ একটা শোককে অবলম্বন করে' যদি কবিতা লেখা হয়, তাহলে কবির অন্তরের অনুভূতি ও ভাব-ব্যঞ্জনার মিশ্রনে তাকে ব্যক্তি-বিশেষের সীমাবদ্ধ শোককে ছাপিয়ে বিশ্বমানবের চিরন্তন বেদনার পর্য্যায়ে উন্নীত করতে হবে—নচেৎ কাব্য হিসাবে তা হবে অসার্থক। যদি কোন নারীর আলেখ্য আঁকা হয়, তাহলে বাস্তবে তাঁর যা রূপ, তার ওপর এমন একটা নৈর্ব্যক্তিক সত্তা আরোপ করতে হবে, যাতে তিনি তাঁর প্রত্যেক অস্তিত্বকে ছাপিয়ে উঠতে পারেন। তাঁরা বলতেন, সংবাদপত্রের বিবরণ যেজন্যে সাহিত্য নয় এবং ফোটোগ্রাফ যেজন্যে চিত্রকলা নয়, তা এই যে তাতে হৃদয়বৃত্তির সংস্রব নেই—তা নিতান্তই যান্ত্রিক উৎপাদনের শ্রেণীভুক্ত। তাঁরা শিল্পকে হৃদয়-সম্পর্ক সঞ্জাত বলে' মনে করেছিলেন এবং বাস্তব উৎপাদনের ওপর এই হৃদয়বৃত্তির সংযোজনা করে' তাকে বাস্তবাতীত বা অতীন্দ্রিয় করে' তোলারই পক্ষপাতী ছিলেন।

এই অতীন্দ্রিয়তা বলতে তাঁরা কি বুঝতেন? তাঁরা বুঝতেন যা স্থূল, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাতে মানুষের অসীম প্রয়োজন হলেও, পরিতৃপ্তি নেই—জীব হিসেবে তার প্রত্যক্ষ জীবন ইন্দ্রিয়ের জগতে আবদ্ধ হলেও, তার ভাব-জীবন এতে আবদ্ধ নয়। তা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই স্থূলের মাঝখানে আড়াল রচনা করে' সূক্ষ্মের অনুসরণ করে এবং যা নেই, যা হয় না, যা পাওয়া সম্ভব নয়, তাকেই আপনার বাসনা দিয়ে' সৃষ্টি করে' নেয় এবং তারই স্বপ্নানুরঞ্জিত ভাবেষ্টনীর ভেতর নিজেকে নির্ব্বাসিত করে' বাস্তব জীবনের ব্যর্থতা, ক্ষয় ক্ষতি ও যন্ত্রণাকে ভুলতে চেষ্টা করে। প্রত্যেক মানুষের ভেতরই যে একটা করে' প্রত্যক্ষ-পুরুষ এবং একটা করে' ভাব-পুরুষ থাকে, এটা পুরানো মতে স্বীকৃত হ'ত—এবং প্রত্যক্ষ থেকে ভাবে পৌছানোকেই এই মত অনুসারে শিল্পের আদর্শ বলে' ধরা হ'ত।

এই মতের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে আর্টের মূল সূত্র এই দাঁড়ায় যে আর্ট জন্মাবে বাস্তব থেকেই, কিন্তু কল্পনার অনুরঞ্জনে সে-বাস্তব প্রাত্যহিকতার গণ্ডী কাটিয়ে নিত্যকার চিন্ময় রূপ গ্রহণ করার পর তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংস্রব ছিন্ন হয়ে যাবে—কাজেই বাস্তবে যে জিনিষ যে জৈব-বৃত্তির উদ্দীপক ছিল, রসাস্বাদন লাভের পর তা আর তা করবে না, শুধু অখণ্ড আনন্দই দেবে। অর্থাৎ বাস্তবে যে সমস্ত জিনিষ কাম-ক্রোধ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা বা এই জাতীয় জান্তব-বৃত্তির পরি-পোষক, আর্টের রাজ্যে তারা নিরুপাধিক—সেখানে তারা নির্ব্বিকল্প ভাবানুভূতির বাহক। যাকে সাধনতত্ত্বে বলে তুরীয়—আর্ট সেই তুরীয় মার্গের সোপান স্বরূপ। এই জন্যেই প্রাচীন রস-শাস্ত্র ব্রহ্মানুভূতি ও রসানুভূতিকে দুই সহোদর বলে' ব্যাখ্যা করেছিলেন।

এখনকার দিনে আর্টের এই আদর্শকে বাতিল করা হয়েছে এবং বলা হচ্ছে যে এটা ধোঁকাবাজী—প্রত্যক্ষকে, বাস্তবকে, অতিপ্রাকৃত একটা ব্যঞ্জনা দিয়ে, তার সত্য রূপটিকে খর্ব্ব করা এবং সেই মন-গড়া মিথ্যাকে পরম ও চরম বলে' প্রকাশ করা, অলস কল্পনা-বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। এটা এখনকার মতে অবৈজ্ঞানিক এবং সেই জন্যেই অসমর্থনীয়।

এখনকার রসিকেরা বলছেন, আমাদের সমস্ত অনুভূতির মূলই হচ্ছে ইন্দ্রিয়—বহির্জগতের সঙ্গে মনোজগতের বস্তু-দ্বন্দ্ব থেকেই আমাদের চেতনা সক্রিয় হয়—এই ক্রিয়াশীলতার কতকটা দেহগত চরিতার্থতা দিয়ে শেষ হয়, কতকটা বাইরে থেকে বাধা পেয়ে অন্তরে তরঙ্গিত হতে থাকে। অন্তরের এই যে তরঙ্গ, এ শুধু বাস্তবকে উপলক্ষ্য করেই সঞ্জাত নয়—বাস্তবকে কেন্দ্র করেই এর আবর্ত্তন এবং এইজন্যেই এটা অতীন্দ্রিয়ও নয়, তুরীয়ও নয়। যদি, বাইরের সঞ্জাত থেকে যে ইন্দ্রিয়াসক্তির উদ্দীপনা এসেছিল, তা পূর্ণতার পথ পেতো, তাহলে হাতে-হাতেই তার সঞ্চয় ফুরিয়ে যেতো এবং তা নিয়ে অপরোক্ষ চরিতার্থতার জন্যে ভাব-রাজ্যে নিষ্ফল মাথা-কোটার দরকার হতো না। কিন্তু ক'টা সচেষ্ট ইচ্ছাই বা আমাদের পূর্ণ হয়। মানুষের শক্তির একটা সীমা আছে, তারপর আছে সমাজ, রাষ্ট্র, নীতি—আরো অনেক কিছু, যা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমাদের বহুবিধ অভিলাষের মুখে লাগাম টেনে দিচ্ছে। এই ইচ্ছাগুলিকে মনে মনে উপভোগ করা ছাড়া পথ নেই—এই মনো-রমণ তা বলে' ব্রহ্মানুভূতির সগোত্রীয় নয় এবং বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন একটি নিরুপাধিক ভাব-ক্রিয়াও নয়। এর উৎপত্তি বাস্তব থেকে এবং স্থিতিও দেহেই সীমাবদ্ধ—সুতরাং এটা ব্যক্তিক। মানুষের আবয়বিক অস্তিত্বটা জড়, এবং তার মানসিক অস্তিত্বটা চিৎশক্তিসম্পন্ন—এদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই মানুষ সজীব। এর একটিকে আর একটি থেকে পৃথক করে' নেয়া যায় না—একটি আছে বলেই অন্যটি আছে, এবং একটি যখন থাকবে না, অন্যটিও তখনি অন্তর্হিত হবে। অতএব মনের প্রসঙ্গে যা সত্য, দেহের প্রসঙ্গে তা মিথ্যা হতে পারে না—হওয়া সম্ভব নয় বলেই। কিন্তু কথা উঠবে, তাহ'লে কি

কল্পনার কোন অবকাশ নেই? অবশ্যই আছে—কিন্তু সেটা বাস্তব-নিরপেক্ষ নয়, তাই তাকে যখন রূপায়িত করতে হবে, তখন তাকে বাস্তবাতীত ব্যঞ্জনা দেবার কোন মানে হয় না।

আগেই বলেছি, বেটা পাওয়া গেল, তার ত হিসাব-নিকাশ চুকেই গেল—বেটা হাতে এলো না, তাই রয়ে গেল মনে এবং তাই নিয়েই আর্ট। অর্থাৎ আর্ট হচ্ছে, অবদমিত ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণ। কিন্তু 'আর্ট তাই বলে' আফিঙের নেশা নয়—রূপ থেকে অরূপে, ইচ্ছা থেকে ভাবে টেনে নিয়ে গিয়ে মানুষকে বৃথা ঠকানো হয় মাত্র। সুতরাং যা সত্য, যা প্রত্যক্ষ, যা প্রত্যাশিত, মানুষের মনোধর্ম্ম যখন তারই অনুগামী, তখন তাই হওয়া উচিত আর্টের লক্ষ্য এবং যে স্বপ্ন, যে কল্পনা, যে অনুভব প্রত্যক্ষের মাটিকে কেন্দ্র করে' জন্মায়, তাকে নিরবলম্ব ঊর্দ্ধে নিরাশ্রয়ভাবে উড়িয়ে দিলে আর্টের কোনই মানে থাকে না। অর্থাৎ আর্টের জন্যই আর্ট নয়, জীবনের জন্যেই আর্ট—এবং তার মানে আর কিছু নয়, এই।

(২)

প্রাচীন ও আধুনিক রসশাস্ত্রের ভেতর নীতির দিক থেকে এই যে বিরোধ—এটা একদিনেই জন্মায়নি এবং কেতাবী মতে যেমন দুটো পর্য্যায়ের নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা টেনে দেওয়া সহজ, কার্য্যতঃ দুয়ের এলাকা বাঁচিয়ে চলা তত সহজ নয়। তবু' মোটামুটিভাবে একটা হিসেব চলতে পারে।

যে শ্রেণীর সাহিত্যকে ইদানীং কালে বস্তুঅনুগামী বলা হয়ে থাকে, তার স্বরূপ আলোচনা করলে প্রথমেই যে জিনিষটা চোখে পড়ে, তা হচ্ছে দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন। যে সমস্ত বিষয় একসময় শিল্পসৃষ্টির পক্ষে অনভিজাত বলে' মনে করা হ'ত, এখনকার দিনে সেগুলোকে শুধু স্বীকার করেই নেয়া হয়নি—তাদের রীতিমতো মর্য্যাদা দিয়েই গ্রহণ করা হয়েছে। আগেকার দিনে সমাজ-জীবনের গোড়ার পর্ব্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের নিয়েই সাহিত্য হ'ত—যা সুন্দর, যা মহান, যা মনোজ্ঞ, তার ওপরই দেখা যেতো শিল্পীদের ঝোঁক। এখনকার দিনে সমাজের নিম্নতন স্তরের যারা, তারা সবেগে সাহিত্যে এসে ভীড় করেছে—যা কুশ্রী, কদর্য্য, যা উপেক্ষিত, সেগুলো জড়ো হয়েছে চিত্র-শিল্পের আসরে। আধুনিকেরা বলছেন, জগতের এই দিকটাই হচ্ছে সত্যিকার দিক, এবং এদিকে নজর না করায়, প্রাচীনদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল অবাস্তব, এবং এই জন্যেই অসত্য।

কিন্তু সত্য ও অসত্যের স্বরূপ নিয়ে বিচার করলে, কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়ত খুব সহজ নয়। জগতে শুধু পঙ্কটাই সত্যি, আর পঙ্কজটা কি মিথ্যা? ব্যথিত, পতিত, উপেক্ষিতরাই একমাত্র সত্যি, আর ধনী, সম্পন্ন, সৌভাগ্যশালীরা কি মিথ্যা? ভালো ও মন্দের দুই চরমপ্রান্তের সমাবেশেই জগৎ এবং এর একটা দিক যতটা সত্যি, আর একটা দিক ততটা না হ'ক, অনেকটাই সত্যি। সুতরাং সত্যই যদি একমাত্র মাপকাঠি হয়, তাহ'লে প্রাচীন এবং আধুনিক, উভয় আদর্শই খণ্ডভাবে সত্য—বাস্তব সত্যকে প্রাচীনেরা কল্পনার ভেজালে আবৃত করে' রাখতেন এবং আধুনিকেরা বাম-মার্গীয় প্রপাগ্যাণ্ডায় ধূমায়িত করে' রাখছেন। আসল সত্য যা, নির্ব্বিশেষ, নিরুপাধিক, নিছক সত্য—তা ওঁরা বা এঁরা কেউই অবলম্বন করেন নি। প্রাচীনেরা কল্পনার দোহাই

দিয়ে সুন্দরকে একমাত্র সত্য বলে' গ্রহণ করেছিলেন, অসুন্দরটা তাঁদের বিচারে ছিল অসৎ—আর আধুনিকেরা এরই পাল্টায় অসুন্দরকেই দিচ্ছেন ষোলআনা স্বীকৃতি এবং বলছেন এটাই সত্যি। এই দৃষ্টি-বিরোধের ফলেই প্রাচীনদের ভাব-বিলাস, আধুনিকদের তথাকথিত বাস্তববাদে পর্য্যবসিত হয়েছে।

এ যুগের রাজনীতি ও সংস্কৃতি মানুষকে যে চিন্তা-বিপ্লবের মধ্যে টেনে এনেছে, যন্ত্র-বিজ্ঞানের সবিশেষ উন্নতি সেই বিপ্লবকে যে-পরিমাণ পোষকতা করেছে, এবং সর্ব্বোপরি রুশীয় সমাজতন্ত্রবাদের ব্যাপক বিস্তার এই বিপ্লবকে যতটা ভবিষ্যৎ সম্ভাবনীয়তার সুযোগ দিয়েছে, তাতে সাহিত্যাদর্শেও ওলট-পালট অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ঘটে' গেছে। এই ভাব-বিপর্য্যয়কে মোটা কথায় বাস্তবতা আন্দোলন নাম দেয়া হয়েছে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে হ'লে, বলা দরকার যে বাস্তবতা সংজ্ঞাটা আধুনিক আন্দোলনকে ষোল আনা বুঝতে সহায়তা করে না।

যা এতদিন অনভিজাত বলে' উপেক্ষিত ছিল, তাকে গ্রহণীয় করে' তোলাতেই যে বাস্তবতার যথেষ্ট মর্য্যাদা স্বীকৃত হয়েছে, তা নয়। বরং নূতন দৃষ্টি ও ভাবাদর্শ প্রবর্ত্তনের উন্মাদনায় আধুনিকেরাও বাস্তব থেকে ঠিক ততখানিই দূরে গিয়ে পড়ছেন, যতখানি দূরে ছিলেন প্রাচীনেরা রসাত্মকতার নাম নিয়ে। আজকের সাহিত্যে মানুষের স্বাভাবিক জীবনে সচরাচর প্রত্যাশিত নয় যে-সমস্ত জিনিষ, তার যে বিশেষ আধিক্য হয়েছে, সে-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। শুধু যে ব্যথিত পতিতের জীবনাধিকার প্রতিষ্ঠিত করাই এ যুগের সাহিত্যের একমাত্র অবলম্বন নয়, এ কথাও তর্কাতীত। মনোবিজ্ঞানের আধুনিকতম পরিণতির একটা ধারা ইদানীং আমাদেরকে অবচেতন-লোকের অভিমুখে আকর্ষণ করেছে—সেই অদৃশ্য লোকের অসংবিন্যস্ত ইচ্ছাপুঞ্জকে চিত্রে এবং কাব্যে রূপ দেবার মুখে যে-শ্রেণীর আর্ট জন্ম নিচ্ছে, তা যে বাস্তব নয় এবং পুরাতন কল্পনাবাদেরই আর এক পিঠ, এ কথা প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন। ঠিক তেমনি, নব্য প্রজ্ঞা-বাদের তাড়নায় মানুষকে পরস্পর-বিরোধী আইডিয়ার বাহন রূপে দাঁড় করিয়ে, তাদের ব্যক্তি-জীবনের সমস্ত দ্বন্দ্বকে আইডিয়ার সঙ্গে আইডিয়ার দ্বন্দ্বে পরিণত করার দ্বারা যে নৈর্ব্যক্তিক সাহিত্য সৃষ্টি চলছে, তার সঙ্গেও বাস্তবের কোন যোগ নেই।

সমাজতন্ত্রবাদের প্রেরণায় বামপন্থী সাহিত্য নামে যে-শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে, তা অবশ্য বাস্তবানুগামী। কিন্তু ফ্রয়েড, আইনষ্টাইন, প্যাভলভ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার প্রভাবে যে সাহিত্য জন্ম নিচ্ছে, তা ষোলআনাই বস্তু-নিরপেক্ষ এবং সেইজন্যেই প্রচলিত হিসাবে সত্য-বিরোধী। এই দুটি বিরুদ্ধ আদর্শই সমান শক্তিতে আজকের সাহিত্যে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে চলেছে। এর ভেতর, প্রথমের গতি জনতার দিকে, আর দ্বিতীয়ের গতি মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবিদের দিকে—কিন্তু বুদ্ধি-জীবি ও বৃত্তিজীবি, ক্লাস ও ম্যাস, দুই নিয়েই সমাজ এবং সাহিত্য সমগ্রভাবে সমাজেরই প্রতিরূপ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাস্তবতার চেয়ে ঢের বিস্তৃত পটভূমিতেই আজকের সাহিত্যের প্রাণবস্তু নিবদ্ধ।

বলা বাহুল্য, ভালো-মন্দের কথা আমি তুলিনি। যুগধর্ম্মে স্বভাবতঃই সাহিত্যে পরিবর্ত্তন এসেছে, এবং সে-পরিবর্ত্তন, নানা কার্য্য-কারণ প্রভাবেই অত্যন্ত জটিল ও যৌগিক হয়ে উঠেছে। এরই খুব বড় একটা দিক হচ্ছে, তথাকথিত বাস্তবতাবাদ—যার স্বরূপ নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি।

মৃত চোখ

জ্যোতির্ম্ময় রায়

সন্ধ্যায় চা পান শেষ করিয়া সবে বাহির হইবার জন্য পা বাড়াইয়াছি এমন সময় বাহিরের দরজা দিয়া কাহারা প্রবেশ করিলেন। মহিলা দেখিয়া পথ ছাড়িয়া একপাশে সরিয়া দাঁড়াইলাম। সুধার বন্ধুবান্ধবের অন্ত নাই, ভাবিলাম তাঁদেরই কেউ হইবে। দয়া করিয়া আর একটু আগে আসিলেই হইত ভাল; সস্ত্রীক বায়ু-সেবনে বিঘ্ন ঘটানর দায়টা বন্ধুর গানের আসর বাঁচাইয়া ইহাদের ঘাড়ে চাপানো যাইত, এবং দাম্পত্য শান্তি অব্যাহত রাখিয়াই বাহির হইয়া পড়া যাইত।

যাঁহাদের জন্য পথ ছাড়িয়া দেওয়া তাঁহারা কিন্তু আমারই নিকট আসিয়া থামিয়া পড়িলেন। অগ্রবর্ত্তিনী স্থূলকায় মহিলাটি নমস্কার জানাইয়া কহিলেন, চিনতে পারেন?

পূর্ব্বে পারি নাই, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিতেই স্মরণ হইল। বছর তিন পূর্ব্বে বায়ু-পরিবর্ত্তন উপলক্ষ্যে দুমকায় গিয়া পরিচয় হইয়াছিল, তিনি তখন সেখানকার মাইনর স্কুলের শিক্ষয়িত্রী। মাথার দিকে নজর পড়িতেই বুঝিলাম ইতিমধ্যে বিশেষ একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে।

চিনিয়াছি, এ-স্বীকারোক্তি করিবার পূর্ব্বেই অনুভা দেবী বলিয়া উঠিলেন, আগে বসতে তো দিন, তারপর ধীরে-সুস্থে চিনতে চেষ্টা করুন—বাব্বাঃ, এতটুকু পথ চলতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়—বলিয়া শ্রান্তিসূচক একটা নিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

বেশ স্থূলকায় ছিলেন, এখনো স্থূলতর হইয়াছেন। চলিতে কষ্ট হইবারই কথা। কপালে ও ঠোঁটে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে। একটা চেয়ার আগাইয়া দিতেই ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। মানুষটি বেশ খাটো, পা দু'খানা মাটি স্পর্শ করিতে না পারিয়া ঝুলিয়া থাকে। মুখের তুলনায় অত্যন্ত ছোট একখানা রুমাল বাহির করিয়া সন্তর্পণে মুখের ঘামটুকু আলগোছে শুষিয়া লইলেন। তারপর রুমাল নাড়িয়া পাখার প্রয়োজনীয়তা ইঙ্গিত করিতেই ভৃত্যকে ডাকিয়া আজ্ঞা দিলাম উপর হইতে জল্‌দি একটা পাখা নিয়া আসিতে এবং মাইজীকে নীচে পাঠাইয়া দিতে। যুগপৎ মাইজী ও পাখার জল্‌দি তলবে সুধা আবার কোন দুর্ঘটনা আশঙ্কা করিয়া ছুটিয়া না আসে সেজন্য পুনরায় ডাকিয়া এক মাইজী যে বেড়াইতে আসিয়াছেন সে-কথাটাও জানাইতে বলিয়া দিলাম।

অনুভা দেবীর সঙ্গে আসিয়াছে একটি আঠার উনিশ বছরের মেয়ে এবং বছর সাতেকের একটি বালক। উহাদের বসিতে বলিয়া অনুভা দেবীকে প্রশ্ন করিলাম, এখানে আছি জানলেন কি করে'?

—আপনি তো আর খোঁজ নেবেন না, কত হাঙ্গাম করে' তবে আপনার ঠিকানা যোগাড় করেছি। ক'দিন ধরেই চেষ্টা করছি আসবার, হয়ে ওঠেনি। বাড়ীর মেয়েদের

নিয়ে বেরুবার নামে ছেলেদের মাথায় যেন বাজ পড়ে, চাকরগুলো থাকে ব্যস্ত, শেষপর্য্যন্ত ঝুণ্টুকে নিয়েই বেরিয়ে পড়তে হলো।

ব্যক্তিত্বের উপলব্ধিতে ঝুণ্টুবাবুর মুখ গম্ভীর হইল। সঙ্গে লইয়া বাহির হইবার মত ব্যক্তি বটে! টিকি-ছাঁটা আন্দোলনে ছাঁটাই কাজটা খুব দ্রুতই অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু বেশ লম্বা একটা সময় প্রয়োজন হইয়াছিল তার শেষ চিহ্নটুকু লোপ করিবার সাহস সঞ্চয় করিতে। নামেমাত্র হ'ক, তবু পুরুষ-প্রহরার কুসংস্কার আজও মেয়েরা পুরাপুরি কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

পাখা হাতে করিয়া সুধা ঘরে ঢুকিল। সুধার পরিচয় দিবার জন্য অনুভা দেবীকে কহিলাম, ইনি-ই মিসেস সেন, আমার বেটর হি-ফোর্থ। সুধা, ইনি হ'লেন অনুভা দেবী—

অনুভা দেবী বাধা দিয়া কহিলেন, থাক্, আপনি যা জানতেন তা গতাসু। বলিয়া সুধার মুখের উপর চোখ রাখিয়া একটু চুপ করিলেন।

অন্তরে জ্বালাবোধ করিবার মত ভাল লাগিয়াছে বলিয়াই মনে হইল। অনুভা দেবীর চেহারাখানাও শ্যাম বর্ণের উন্নত আদপে মন্দ নয়, নাক-চোখ-ভ্রূ ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দেখিলে প্রশংসনীয় বলা চলে। কিন্তু বুদ্ধি আর রূপ স্থূলত্বে পা দিলেই মর্য্যাদা হারাইতে সুরু করে।

দুমকার সন্ধ্যাগুলি অধিকাংশই কাটাইয়াছি অনুভা দেবীর বাড়ীতে। শেষের দিকে আমাকে ভুল বুঝিয়াই হয়তো তিনি একটু ভাবপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছিলেন—তাই বিনা আড়ম্বরে একেবারে সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। পরিচ্ছদের জাঁক দেখিয়া উপস্থিত পরিবর্ত্তন সম্পর্কে মনটা কৌতূহলী হইল। বিধবা মা ও তিনটি বোনের ভরণপোষণ নির্ভর করিত এঁরই উপার্জ্জনের উপর, তাঁরাই বা এখন কোথায়?

কোন প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই অনুভা দেবী পাখাটাকে বারকয়েক মুখের সামনে দ্রুত আন্দোলিত করিয়া কহিলেন, আমি মোটা বলে' সকলে, এমন কি আপনিও কত ঠাট্টা করেছেন; অমন অবস্থার মধ্যেও এই মোটা চেহারা'টি'কে ছিল বলেই না আজ কুসুমপুরের চৌধুরী-বাড়ীর গিন্নী হয়ে খাসা মানিয়ে গেছি। ঠাকুরপো বলে, হাকিম সে না হয়ে আমি হলেই নাকি মানাতো ভাল।

বোঝা গেল জমিদারের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে এবং দেবর হাকিম।

ঘরে হুড় হুড় করিয়া হাওয়া ঢুকিতেই অনুভা দেবী আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া চেয়ারে গা ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন, আঃ, বেশ হাওয়া দিচ্ছে; আমাদের বাড়ীতেও ঝড়ের মত হাওয়া!

বাড়ীর কথা উঠিতে প্রশ্ন করিলাম, আছেন কোথায়?

—এই তো খুবই সামনে। অবিশ্যি এ-বাড়ীতে আর বেশী দিন নেই—ভাড়ার লোভে পুরোনো বাড়ীতে পড়ে' থাকব, এ কিপ্টেমী আমার সহ্য হয় না। ওঁরা অবিশ্যি অনুহাত দেখান সহর থেকে দূর পড়ে' যায়; চলিস তো বাপু গাড়ীতে, তোদের আবার দূর আর সামনে কি!

কলিকাতা সহরে একাধিক বাড়ী এবং গাড়ী; অনুভা দেবী বেশ বড় দরেরই পাকড়াও করিয়াছেন। কিন্তু এ ঐশ্বর্য্যের কাহিনী শুনাইবার জন্যই আমাকে কষ্ট করিয়া খুঁজিয়া বাহির

করিয়াছেন না অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে বুঝিতে পারিলাম না। এ প্রকারের কথাবার্ত্তা উপভোগ করিবার মত উদারতা মেয়েদের মধ্যে না থাকাটা স্বাভাবিক, সুধার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল সে বিরক্ত হইয়াছে। আলোচনার মুখ ঘুরাইবার জন্যই হয়তো প্রশ্ন করিল, এ মেয়েটি কে, বললেন না তো?

—রেণু, আমার ছোট বোন। আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, আপনি দেখেননি ওকে, ও তখন ছিলনা দুমকায়। আপনি দেখেছেন শান্তি আর বাণীকে, ওদের দু'জনেরই বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। বাণীর বর কাজ করে পোষ্টাফিসে; শান্তির ভাসুর এ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, দেওর কাজ করে কালেক্টরীতে, বেশ বড় পরিবার। ও এবার ম্যাট্রিক দিয়েছে। এখন এ আপদ বিদেয় করতে পারলেই বাঁচি।

কথাটা খট্ করিয়া কানে বাধিল। বোনদের জন্য কতটা স্বার্থত্যাগ করিতেছেন এমনভাবে আঘাত দিয়া বুঝাইয়া দেওয়াটা কোনমতেই সমর্থন করা যায় না।

পূর্ব্বের চেয়ে বেশী কথা বলেন। একটু থামিয়াই সুরু করিলেন, দেখুন দিকিনি বত্রিশ বছরেই কেমন জাঁকিয়ে গিন্নী হয়ে বসেছি—

বয়স গোপন করার প্রয়োজন মিটিয়া যাওয়ায় কথাটা অজ্ঞাতে মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, নিজের কানেই সংখ্যাটা বোধ হয় বেশী মনে হইল, সংশোধন করিবার উদ্দেশ্যে কহিলেন, বত্রিশ না হলেও আটাশ-উনত্রিশ তো নিশ্চয়ই—বয়স বাড়িয়ে বলার অভ্যাসের দরুণ মা'র কাছে কত বকুনিই না খেয়েছি।

বোনদের এমন রেটে বিবাহ দিতেছেন, অর্থাৎ বাপের বাড়ীর জন্য এতটা করিবার ক্ষমতা রাখেন শুনিয়া আমাকে খোঁচা দিবার জন্যই বোধ হয় সুধা জিজ্ঞাসা করিল, শাশুড়ী আছেন?

—না, শ্বশুর আছেন, একেবারে ভোলানাথ। আর আছে জায়েরা। বড়জা নিখুঁত সুন্দরী, মেজো বি, এ, পাশ, ছোট এখানে নেই—গেছে দাদার কাছে, দাদা এলাহাবাদে খুব নাম-করা ব্যারিষ্টার।

আমি ও সুধা দু'জনেই একবার নড়িয়া চড়িয়া বসিলাম। কোন প্রশ্ন না করিয়া এত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াও উভয়ে সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। সুধা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইল,—অর্থ, তোমার গানের বৈঠকের তাড়াহুড়া গেল কোথায়। কি করি, আমারই সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, ফেলিয়া যাওয়া কোনমতেই সমীচীন হইতে পারে না।

ধূম্র-পিপাসা বোধ করিলাম। কেস হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া কহিলাম, পূর্ব্বে তো আপত্তি ছিল না, এখন জমিদার-গিন্নী হওয়াতেও আশা করি আপত্তি উঠবে না।

—কিছু না, আপনি অনায়াসে ধরাতে পারেন। ঠিক, আপনি তো গান শুনতে খুব ভাল বাসতেন, রেণু বেশ গাইতে পারে—গা' তো রেণু একটা।

শ্রোতার আগ্রহ সম্পর্কে খোঁজ নিবার মত আগ্রহ আদেশকর্ত্রীর আছে এমন কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ফ্রক-পরিহিতা নয়—অতএব এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত, নৃত্যের আদেশ

হইবে না। আধুনিক খুকী ও তাহাদের অভিভাবকদের কলাচর্চ্চার দরুন কোন বাড়ীতে প্রথম প্রবেশটা দাঁড়াইয়াছে বিপদজনক; দর্শক ও শ্রোতা হিসাবে বসিয়া থাকিয়া অবশেষে তারিফ করিয়া তবে ছুটি।

রেণুর চোখের ক্ষীণ আপত্তি দিদির দৃষ্টির কঠোরতার সম্মুখে হাল ছাড়িয়া দিল। কম্পিত কণ্ঠে গান সুরু হইল। সুরু হইতে শেষ সব ছাড়িয়া মাঝখান হইতে একটি মাত্র পদ অর্থের দৌলতে কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। 'দুয়ার যদি না খোল প্রিয়, সারাটি রাতি রহিব জাগি—'. প্রিয়-র ভয় পাইবার কথা বটে; 'বুকের বীণা ছন্দহীনা...', তাহার উপর রাত্রিব্যাপী বক্ষ-বীণার ছন্দহীন শব্দ!—উপস্থিত পনের মিনিটেই শেষ হইল এই যা ভাগ্য।

সঙ্গীতের সময়টা অনুভা দেবী আমার মুখের উপর একটু যেন কেমনভাবেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়াছিলেন। সুধার উপস্থিতিতে একটু অস্বস্তি বোধ করিতে ছিলাম। গান শেষ হইলে একটু সময় তেমনি চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া অনুভা দেবী মুখ টিপিয়া হাসিলেন, তারপর নেহাৎ খাপছাড়াভাবে বলিয়া বসিলেন, এ চোখ জোড়ার মূল্য কম নয়, বুঝলেন!

অর্থাৎ কিনা এ চোখ দিয়া আমার চেয়ে অনেক বড় জিনিষ জয় করিয়াছেন। কথাটা রুচি বহির্ভূত সন্দেহ নাই।

সুধা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমার একটু কাজ রয়েছে, আমি উঠলাম। বলিয়া বিরক্তি গোপন না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

কিংকর্ত্তব্য স্থির করিবার চেষ্টা করিতেছি এমন সময় ঝুণ্টু কহিল, খুড়ীমা চলো, বাড়ী যাবে না?—ছেলেমানুষ, বেচারার কাছে সমস্ত সময়টাই শান্তি-বিশেষ মনে হইবার কথা।

—হ্যাঁ বাবা চলো, বলিয়া অনুভা দেবী উঠিয়া পড়িলেন।

একটু জলখাবারের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল, ইচ্ছাও ছিল, কিন্তু কেমন যেন সব গুলাইয়া গেল। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলাম; অনুভা দেবী বলিলেন, চলুন, একটু এগিয়ে দেবেন।

মুখ বুজিয়া পথ চলিতেছিলাম, অনুভা দেবী কথার অবতারণা করিলেন। কহিলেন, চোখ জোড়ার দাম আছে বলাতে আপনারা দু'জনেই বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছেন, না?

—কথাটা শুনতে একটু—

—তা বটে। মনে অন্য কথা ছিল, গেয়ালই হয়নি এর আর একটা দিক আছে। কি ভেবে বলেছিলাম বলবার আগে, একটা গল্প বলছি শুনুন: দাদামশায়ের ভারি মাছ ধরার বাতিক ছিল, একদিন বাড়ী ফিরে বল্লেন, অনু, আজ এত বড় একটা রুই আট্‌কেছি।

অনুভা দেবী দাদামশায়ের ভঙ্গীর নকলে বাঁ হাতখানা মাথার সমান উঁচু করিয়া মাছের দৈর্ঘ্যটি দেখাইলেন। তারপর বলিয়া চলিলেন, একটা মানুষের সমান মাছ—বিশ্বাস হ'ল না, যখন দেখতে চাইলাম বললেন, দাঁড়া না, এখন পর্য্যন্ত তো তলায় দাগ টানিইনি। বলিয়া পুনরায় দাদামশায়ের অনুকরণে বাঁ হাতের বিঘত নীচে ডান হাতের তেলোটা এমন ভাবে বিছাইয়া ধরিলেন যে দৈর্ঘ্যটা খাটো হইয়া বিঘতে দাঁড়াইয়া গেল।—আমার এখনকার কথাগুলো হবে ঐ তলায় দাগ-টানার মত।

পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম না কি তিনি বলিতে চান।

একটু থামিয়া আবার সুরু করিলেন : কাগজে 'কর্ম্মখালি' দেখবার ছলে দৃষ্টিটা 'পাত্র-পাত্রী' কলমের উপর দিয়ে প্রতিদিনই একবার ঘুরে আসতো—তখন কেটে ফেল্লেও হয়তো এ কথা স্বীকার করতাম না—

অম্বুভা দেবী একটু হাসিলেন, দুঃখ ও কৌতুক মিশানো হাসি।

—হঠাৎ একদিন নজরে পড়ল, স্বজাতি এক বড়লোক তাঁর ছেলের জন্যে অন্ধ-পাত্রী চেয়ে এক বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। অন্ধ কেন চান তার কারণ একটা ধরে' নিয়ে চিঠি ছাড়লাম। ছেলের বাবা, অর্থাৎ এখন যিনি আমার শ্বশুর, নিজেই আমার ওখানে গিয়ে হাজির। ছেলের চেহারা সম্বন্ধে একটা আভাষ দিতে চেষ্টা করে' অবশেষে বললেন, চোখ থাকতে অন্ধের অভিনয় করবার মত সহজ ব্যাপার নয় মা, তুমি নিজের চোখে একবার না দেখা পর্য্যন্ত তোমার সম্মতি আমি গ্রহণ করতে পারব না। দেখলাম.....আগুনে সমস্ত মুখটাই প্রায় পুড়ে গিয়েছিল, শরীরেরও অনেক যায়গা—চুল, নাক আর একটা চোখ একেবারেই নেই—বুঝতেই তো পারেন, ওরা নিজেরাই চেয়েছিল অন্ধ.....বোনগুলোর কথাই তখন মনের সামনে ছিল, শেষ পন্থা আমার মত মাষ্টারী বা ক্যানভাসারী.....রাজি হয়ে গেলাম।

চোখের সম্মুখে একটা বিকৃত ও বীভৎস মুখের ছবি ভাসিয়া উঠিয়া আমার সমগ্র স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে মুহূর্ত্তের জন্য একটা অস্বস্তি বোধ জাগাইয়া দিয়া গেল। স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলাম।

অম্বুভা দেবী বলিয়া চলিলেন, বিয়ের পর কিছুদিন যে কী ভাবে কাটিয়েছি.....ওঁর সঙ্গে একা এক ঘরে আছি ভাবতেই অন্তরাত্মা আমার শুকিয়ে যেত। সে যাক —এখন কিন্তু মনে হয় ইস্কুল নিয়ে সময় কাটানো চলে, জীবন কাটাতে হ'লে দরকার একটি সংসার—যাকে 'আমার' বলা চলে। আগে সামনে চাইলে মনে হ'ত সবই যেন ফাঁকা, এখন কাজ আর কর্ত্তব্যের অন্ত নেই.....এই যে এসে গেছি, এটাই আমাদের বাড়ী। চোখ থাকতে আপনার সঙ্গে আলাপ—বাড়ী তো চিনলেন, আসবেন মাঝে মাঝে—

অনুরোধের সুরটি স্পষ্ট। সত্য কথাটা মুখে বাধিল, বলিলাম, আচ্ছা, ফুরসৎ পেলেই আসবো।

নমস্কার জানাইয়া চলিতে সুরু করিলাম। কেন জানিনা, মোড় ঘুরিয়া অন্য রাস্তায় না পড়া পর্য্যন্ত কেবলই মনে হইতে লাগিল, অম্বুভা দেবী তেম্‌নি করিয়া দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন।

সম্মিলনের পশ্চাতে আছে ষ্টালিন, মুসোলিনী প্রভৃতি মূল যন্ত্র-চালকদের ছদ্মবেশী স্বার্থ-সন্ধিৎসা।

হিটলারের এই শান্তিপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হ'লে জার্ম্মানীকে অগত্যা আরো এঁটে কোমর বেঁধে যুদ্ধে নামতে হবে। এবং সে-যুদ্ধ যে কতো ভয়ঙ্কর ও তার সর্ব্বশেষ পরিণতি যে কতোদূর মর্ম্মান্তিক হতে পারে তা ভালো ভাবেই হৃদয়ঙ্গম করে' নাজি-নেতা শান্তির জন্য ক্লান্তিহীন ছুটোছুটি করছেন। শেষপর্য্যন্ত একাস্তই যদি যুদ্ধ আরোও ভীষণতর রূপে আরম্ভ হয় তখন সোভিয়েট-বন্ধু জার্ম্মানীর সঙ্গে সহযোগিতার করমর্দ্দনে আর অগ্রসর হবেন কিনা সন্দেহ! তাই, ভবিষ্যৎ-এর দর্পণে জার্ম্মানীর নিঃসহায়তার রূপ দেখে হিটলার আজ শান্তির নামে স্বগত স্বীকার করছেন : সোভিয়েট ভালুকটিকে খুঁচিয়ে ব্যাপারটাকে জটিল করে' তুললাম নাকি?

লবণে বর্ত্তমান যুদ্ধের প্রভাব

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার কয়েক দিন পরেই গভর্ণমেণ্ট লবণ-এর দাম নির্দ্দিষ্ট করে' দিয়েছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে এক শত মণ লবণের দাম ছিল ৩৫৲ টাকা। যুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই গভর্ণমেণ্ট ঐ দামকে দ্বিগুণ করেন—অর্থাৎ একশত মণ লবণের দাম ৭০৲ টাকা। সম্প্রতি এই মূল্য আরও বর্দ্ধিত হয়ে পাইকারী হিসাবে একশত মণের দাম নির্দ্ধারিত হয়েছে ১২২৲ টাকা।

দরিদ্র ভারতবাসীর নিকট লবণের এই মূল্য-বৃদ্ধির গুরুত্ব অনেকখানি—কারণ, ছবেলাই তার আহার্য্য গলঃকরণ করার সময় সর্ব্বপ্রথম দু' টিপ্ লবণের প্রয়োজন হয়। সব সময়ই যাঁদের আহারের টেবিলে ষোড়শোপচারের আয়োজন থাকে তাঁরা এই দু' টিপ্ লবণের মর্ম্ম বুঝবেন কী করে! তাঁরা বরং বলতে পারেন, কী উপায়ে লবণের ব্যবসায়ে দু' টাকা বেশী মুনফা নিয়ে ঘরে ফেরা যায়।

রক্ত জমা-রাখার ব্যাঙ্ক

কিছুদিন আগে 'কলিকাতা স্কুল অফ্ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে' রক্ত জমা রাখবার একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গত কয়েক দিনে এই ব্যাঙ্কের জন্য প্রায় আট হাজার টাকা ও প্রায় চল্লিশ জন লোকের স্বেচ্ছা-প্রদত্ত রক্ত পাওয়া গেছে।

যে-ব্যক্তি এই ব্যাঙ্কে রক্ত জমা দিতে ইচ্ছুক প্রথমতঃ তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়—পরে তার রক্তও পরীক্ষা করে' দেখা হয়। যদি এই রক্ত গ্রহণযোগ্য হয় তাহ'লে তখন তা জমা হয় 'রক্তের ব্যাঙ্কে'। ঠাণ্ডা ঘরে প্রচুর পরিমাণে রক্ত মজুত রাখবার উপযুক্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্র-পাতিরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপাতত, এই উপায়ে রক্ষিত রক্ত কুড়ি একুশ দিন ঠিক অবস্থায় থাকছে।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে নানা দিক দিয়ে এই ব্যাঙ্কের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে—তবে শুধু রক্তের হৃদে জাতীয় স্বাস্থ্যের পরিপুষ্টি এই লেন-দেন ব্যাপারকে বাঁচিয়ে রেখে কতোদিন চলবে সেইটাই সন্দেহের কথা।

পারাপার

জগদীশ গুপ্ত

ভূধর চাটুয্যের বাড়ীর ঝি রাধাসতী; জাতিতে সে ডোম। ভূধরের স্ত্রী সুভাগিনীর যত জাত্যভিমান আর কুলগর্ব্ব তারই কাছে…বলে: পূর্ব্ব জন্মে অনেক পুণ্যি করলে তবে মানুষ জন্মে বামুনের ঘরে। শাস্ত্রেই আছে, বামুন আর দেবতায় কোনো তফাৎ নাই! এ-কাল কলিকাল বলেই কি শাস্তর উল্টে যাবে! …বলিয়া কলিকালের সুযোগ লইয়া যে অধার্ম্মিকেরা শাস্ত্র-বাক্য উল্টাইয়া দিতে অর্থাৎ লঙ্ঘন করিতে চায় তাদের বিরুদ্ধে সুভাগিনী ভ্রূভঙ্গী করিয়া থাকে…

রাধা ডোমের মেয়ে হইলে কি হয়, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে তার দিব্য হুঁস্ আছে—বলে: সত্যি, দিদিমণি; আমরা ত' তাই-ই বলি। কিন্তু এমন পোড়া ভাগ্যি যে, পা ছুঁয়ে পায়ের ধূলোটুকু নেবার সাধ্যি নেই। এ কি কম দুঃখু আমাদের!

সামাজিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া রাধা নিজের কথা বলিতে থাকে: পাপে মজ্‌ছি ত' তা-ইতে। বামুনের পায়ের ধূলো পেলে পুণ্যির জোরে কবে তরে' যেতাম।—বলিয়া রাধা পুণ্যসঞ্চয়ে বিঘ্নের দরুণ ভারি বিষণ্ণ হইয়া উচ্ছিষ্ট বাসন লইয়া পুকুরে যায়—ব্রাহ্মণের পদধূলির অভাবে যে সংসার দুস্তর ভয়াবহ হইয়া আছে সেই সংসারই যেন তার বুকে আঁতে ধাক্কা দিতে থাকে!

কিন্তু সুভাগিনী ব্রাহ্মণ্য মাহাত্ম্য তাহাকে আরো শুনাইবে।

বাসন মাজিয়া আনিয়া রাধা রোয়াকে উপুড় করিয়া রাখে—

সুভাগিনী বলে: ঐ যে সুতো ক'গাছা দেখিস্ বামুনের গলায়, ও সামান্যি নয়—ওরি ভিতর ব্রহ্মতেজ থাকে।…বলিয়া, যজ্ঞোপবীতকে ব্রহ্মতেজশূন্য সামান্য জিনিস যাহারা মনে করে, সুভাগিনী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া তাহাদের ধৃষ্টতাকে ক্রুদ্ধভাবে শাসন করে…

তারপর বলে: বাজারে সুতো আর পৈতে ত ঢেরই কিন্‌তে পাওয়া যায়—কিনে গলায় পরলেই হ'ল! যার অধিকার নেই সে সাহস করুক দেখি! বলিয়া জনৈক কাণ্ডজ্ঞানহীন দুঃসাহসীকে কল্পনা করিয়া লইয়া সুভাগিনী বিস্ময়ে চোখ বড়ো এবং রাগে মুখ লাল করিয়া তোলে! তার-পর বলে: একবার কি হয়েছিল তা' শোন্।…শুনিতেই হইবে। শুনিতে রাধা রোয়াকে বসে…

সুভাগিনী বলে: আমার বাবা ছিলেন মহা পণ্ডিত কিনা! বিদ্যার্ণব্ উপাধি ছিল তাঁর। নবদ্বীপের দিক্‌গজ পণ্ডিতেরা তাঁকে ডেকে' নিয়ে উপাধি দিয়েছিল। এখন, বাবার ছিল খুব আচার নিয়ম নিষ্ঠা—আমরা তাঁর মেয়ে; তবু আমাদের ছোঁয়াও তিনি খেতেন না। পৈতে গ্রন্থি যখন দিতেন তখন মনে হ'ত যেন জপ করছেন, এম্‌নি নিবিষ্ট! তখন কেউ তাঁকে ডাকুক্ দেখি!

বলিয়া উপবীতগ্রন্থনরত পিতার বিঘ্ন-উৎপাদক জনৈক নির্ব্বোধের দুর্দ্দশা কি ঘটিতে পারিত তাহাই কল্পনা করিয়া সুভাগিনী হাসে, আর পিতার জয়-গর্ব্বে ভারি উৎফুল্ল হয়…

তারপর বলে: লোকের কি দুষ্মতি দেখ্—একদিন একটা লোক, বাবার আলাপী লোকই, কি জা'ত তা' মনে নেই, তবে পৈতে নেবার অধিকার তার নেই; সে একদিন কথায়

কথায় হাস্‌তে হাস্‌তে বাবাকে বল্‌লে, কি সাংঘাতিক কথা!—বল্‌লে, আপনাদের পৈতের কোনো মানে হয় না; অনর্থক সুতো টেনে' বেড়ান্—জামায় গাম্‌ছায় জড়িয়ে অসুবিধের একশেষ হয়…

রাধাসতী হঠাৎ বলিয়া উঠিল: বেলা গেল, দিদিমণি!

—তা' যাক্; শোন্‌ই না, কি হ'ল শেষ পর্য্যন্ত…বামুনের কথায় অমন অশ্রদ্ধা করিস্ নে।

—হেই, দিদিমণি, মাপ করো। বলিয়া রাধা ভয়ে ভয়ে তৎক্ষণাৎ আত্মসমর্পণ করিল—ব্রাহ্মণ যেখানে আলোচ্য বিষয় সেখানে চাঞ্চল্যের দ্বারা অশ্রদ্ধা প্রকাশের অপরাধ যে অমার্জ্জনীয় তাহা সে বোধ হয় অকপটে স্বীকার করে। বলিল,—বলো।

সুভাগিনী বলিতে লাগিল,—বাবা বল্‌লেন, তা-ই না কি! তুমি নিয়ে দেখো' কেমন লাগে। ওমা, বল্‌ব' কি রাধা, তোকে! লোকটা একটা উড়ে' বামুনকে দিয়ে পৈতে গ্রন্থি দিয়ে নিয়ে যেই গলায় দে'য়া অম্‌নি আর যাবি কোথায়! দেখ্‌তে দেখ্‌তে গলা ফুলে হ'য়ে উঠ্‌ল ঢাক্—দম্ বন্ধ হ'য়ে মরে আর কি! শুনে বাবা গেলেন দৌড়ে—গিয়ে তার গলায় খালি হাত বুলিয়ে দিলেন—তৎক্ষণাৎ ফুলো কমে গেল—লোক্‌টা বেঁচে গেল বাবার কৃপায়। অশুদ্ধ দেহে পৈতে সয় না। বামুনকে অপমান করার সাজা কেমন হাতে হাতে পেলে দেখ্‌লি ত'!

বলিয়া অনধিকারী গোঁয়ারের উপবীত ধারণের এই উপাখ্যানের ভিতরকার শিক্ষণীয় মর্ম্মস্থলটি তীব্রভাবে উপলব্ধি করাইতে সুভাগিনী নিষ্পলক চক্ষে রাধার দিকে তাকাইয়া থাকে—

রাধা বলে: তা' আবার নয়! হতেই হবে। উঠি এখন—উঠোনটা ঝাঁট দিয়ে যাই।

ঝাঁটা হাতে করিয়া রাধা তাকায়—সুভাগিনী বলে: তোদের সঙ্গে কথা বলি; তোরা উঠোন্ ঝাঁট দিস্, সেই উঠোনে আমরা বেড়াই; তোদের ধোয়া বাসনে খালি জল বুলিয়ে ঘরে তুলি, এ-তে আমাদের অনাচার হয়। কড়ায় গণ্ডায় আচার মেনে' চলা বামুনের ভারি কঠিন।

—তা' সত্যি, দিদিমণি। আমাদের মতো ত' নয়! আমরা হ'লাম জঘন্য। বামুনরাই ত' আসল দেব্‌তা—নইলে দেব্‌তা আবার কোথায়!

বলিয়া উঠান্ ঝাঁট দিতে দিতে রাধা ব্রাহ্মণ ব্যতীত অধমতারণ অন্য দেবতার অনুসন্ধান মনে মনে করে কি না কে জানে! সুভাগিনী সন্তুষ্ট হইয়া বলে: বাবাও তা-ই বল্‌তেন।

রাধাসতী ভূধরের স্ত্রী সুভাগিনীর ঝি—ঠিকা ঝি, এবং "বাইরের" ঝি। উচ্ছিষ্ট বাসন মাজে, উঠান্ ঝাঁট দেয়, যে-জিনিস সে ছুঁইলে আপত্তি নাই তাহাই সে হাটবাজার কি দোকান হইতে আনিয়া দেয়—মাহিনা পায় মাত্র একটি টাকা; মাঝে মাঝে জলপান কি ভাত পায়, পিঠে পুলি তৈরী হইলেও কিছু কিছু পায়—ভরপেট পায় না। কিন্তু প্রাণ ভরিয়া শোনে সে সুভাগিনীর সামাজিক আর সমুচিত ভাষণ। বলে,—দিদিমণি, তোমার কথা শুন্‌তে আমার ভারি ভালো লাগে!

শুনিয়া ভালো কথা সুভাগিনী পুনরায় বলিতে সুরু করে; বলে: অনুচিত কথা ত' আমি বলিনে! বামুন হ'য়ে শুদ্দ্‌ শান্ত থাকা কি সহজ কথা! তোদের ছায়া মাড়া'লে আমাদের নাইতে হয়!

রাধা বলে: ও মা, তা'-ই দেখি, আমাকে দেখে কেউ কেউ উ—ই রাস্তা ঘুরে' যায়!

—তারা বামুন নিশ্চয়ই।

—তা' আবার নয়!

—কিন্তু আজকাল কেউ কেউ দেখি জুতো পরেই ঢক্ ঢক্ করে' জল খায়—সেই গোচর্ম্ম পরে' !—বলিয়া অনাচারীর প্রতি চোখ রাঙাইয়া শুভাগিনী বলিতে থাকে : থাক্ দেখি এই বাবু আমার সাম্‌নে জুতো না খুলে' জল ! শুন্‌বে তখন কথা যা'কে বলে !

রাধা বলে : বাবুরও আচার ধর্ম্ম বেশ। সন্ধে আহ্নিক করেন।

—করবে না ! বামুন তবে শুধুই ? বলিয়া ভূধর সন্ধ্যা আহ্নিক যথারীতি এবং নিয়মানুযায়ী না করিলে যা ঘটিত তারই প্রতিরোধ করিতে শুভাগিনী চোখ পাকাইয়া থাকে।

রাধাসতী কাজ করে বেশ—দিব্যি পরিষ্কার ঝরঝরে' কাজ ; মাজা বাসনে ভাতের টুকরা কোনোদিন পাওয়া যায় নাই ; উঠান্ ঝাঁট দেয় গায়ের বেশ জোর দিয়া—উপর উপর ঝাঁটা বুলাইয়া যায় না। রাধার চেহারাও মন্দ নয়—রং উজ্জ্বল শ্যাম, অর্থাৎ কালো নয় ; চোখ দুটো বড় বড় ; কালো কুচকুচে চুল আছে রাশীকৃত ; হাতের পায়ের চোগের মুখের ভঙ্গীতে এমন একটা স্নিগ্ধতা আছে যা'তে মনে হয়, কোনো কাজ তার বাধে না, কোনো কথা মুখে আটকায় না।

কিন্তু এখানে ঝি হিসাবে সে ভারি শান্ত। বয়স বাইশ তেইশের বেশী নয়। কিন্তু মাহিনা তার মাত্র একটি টাকা। তবে তার সম্বন্ধে গোপনীয় যে কথা একটা প্রচলিত আছে তা' না বলাই ভালো।

সুভাগিনীর মন রাখিয়া সে চলিয়াছে। সুভাগিনীর বয়স প্রায় রাধারই সমান। বন্ধ্যা বলিয়াই সুভাগিনীর নাম রটিয়াছিল ; কিন্তু বন্ধ্যা সে নয় ; আড়াই বৎসর হইল তাহার একটি কন্যা জন্মিয়াছে—তার নাম খুকী।

আজ সুভাগিনীর বড় জ্বালাতন লাগিতেছে—অনেকটা বেলা হইয়াছে, কিন্তু রাধার এখনো দেখা নাই। উচ্ছিষ্ট বাসন এবং 'বাসি উঠান' সদাচারী ব্রাহ্মণের বাসস্থানে এমনি কদর্য্য বস্তু যে, সে-দিকে তাকাইলে গা ঘিন্‌ঘিন্ ত' করেই, উপরন্তু সভয়ে মনে হয়, গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী-লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন—ভাবিয়া শরীর শিহরিতে থাকে।—ওরা আবার স্ত্রী পুরুষে 'পচুই' মদ খায়—মদ খাইয়া হয়তো—

সুভাগিনী পরের দোষে অলক্ষ্য অলক্ষ্মীর লক্ষণ গৃহে পতিত দেখিয়া চটিয়া লাল হইয়া উঠিতেছে, এবং প্রতি মুহূর্ত্তে তার উত্তাপ বৃদ্ধি পাইতেছে। তার উপর জ্বালাইতেছে খুকী। সে আসিয়া বসিয়াছে রান্না ঘরের বারান্দায়, এবং অত্যন্ত ক্ষুণ্ণার্ত্ত হইয়া কান্না জুড়িয়া দিয়াছে—ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আর একঘেয়ে সুরে সে অসংখ্যবার আবৃত্তি করিতেছে একই কথা : মা, মুড়ি দাও—চারটি দাও, মা, তোমার দু'খানি পায়ে পড়ি—দাও, মা,আমার পেট পুড়ে গেল—দাও, মা, দু'টি—এইবারটি দাও, মা ; আর আমি চাইব না—মরে গেলেও চাইব না—

ভূধরের ঘুম প্রত্যহই একটু বিলম্বে শেষ হয়, এতক্ষণে ঘুম ভাঙ্গিয়া সে প্রথমতঃ শোবার ঘরের জানালা খুলিয়া বাহিরের পৃথিবীটা লক্ষ্য করিল—তারপর প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়া ধীরে ধীরে সে বাহিরে আসিল। খুকী তখনো কাঁদিতেছে।

ভূধর বলিল,—দাও না দু'টি ; ম'ল যে মেয়েটা ! সহ্যও হ'চ্ছে কানে !

কথার আওয়াজ সুভাগিনীর কানে গেল—আগাইয়া আসিয়া বলিল,—কি বল্‌লে ?

—বল্‌লাম, দাও না মুড়ি না কি চায় মেয়েটা।

কিন্তু খুকীর একটানা সুরের ভিতর ভূধরের কথাটা এবারও স্পষ্ট হইল না। মেয়েকেই সুভাগিনী

ধমকাইয়া উঠিল : চুপ কর্, হারামজাদি—কথা শুনতে দে ; তোরই ওকালতি হ'চ্ছে বুঝি ! কি বল্‌ছ ?

শুনিয়া খুকী হঠাৎ আশান্বিত এবং কৌতূহলী হইয়া চুপ করিল—

ভূধর হাই তোলাটা শেষ করিয়া বলিল,—মুড়ি দু'টি দাওনা সামনে, থামুক।

—এনে দাওনা কত্তা। দেড় পহর বেলায় ঘুম থেকে উঠে' হুকুম চালাতে বস্‌লে ! আমি কি বসে' আছি হাত পা কোলে করে' ?—আরাম করছি ?

ভূধরের ঘুমের আলস্য তখনো আছেই ; সে বসিয়া পড়িল ; বলিল,—যা'-ই করো, চারটি দিলেই ত' চুকে' যায় ! বাসি মুখে আর বক্‌তে পারিনে—থুথু উঠছে।

সুভাগিনী বলিল,—থেমে থাকো—বাসি মুখে বক্‌তে তোমায় কে ডেকেছে ?—(খুকীর প্রতি) : আয়, দিচ্ছি তোকে মুড়ি। ফেলে' যদি চলে' যাও আধ-খাওয়া করে' তখন দেখবে তোমার হাড়ের মাসের আলাদা ওজন কত।

হাড়ের মাসের আলাদা ওজন কত তাহা দেখিবার পূর্ব্বে শরীরের কি অবস্থা করিয়া লইতে হয় তাহা খুকী জানে না—সে পুলকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; বলিল,—দাও সবক'টিই খাবো বসে' বসে'

—যাচ্ছিস কোথায় ? বোস্ । বলিয়া সুভাগিনী খুকীকে বসাইয়া দিয়া মুড়ি আনিতে গেল···এতবড় বাটীর পুরা একবাটি মুড়ি আনিয়া খুকীর সম্মুখে ঠাস করিয়া রাখিয়া দিল···

অত রাগ করিয়া খাইতে দিলে খাওয়ার ইচ্ছা অন্তর্হিত হইবারই কথা, কিন্তু তা' হয় বুঝসুঝের লোকের। খুকী মুড়ি পাইয়া মায়ের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল,—দু'খানা বাতাসা···

শুনিয়া ও-বারান্দায় ভূধর হাসিয়া উঠিল।

—বাতাসা ? দিচ্ছি। বলিয়া সুভাগিনী অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া পোয়াটাক্ বাতাসা আনিয়া ঢালিয়া দিল—কতক পড়িল বাটির ভিতর, কতক পড়িল মাটীতে···

খুকী খুশী হইয়া বাটির দিকে ঝুঁকিল, এবং ঠিক তখনই প্রবেশ করিল রাধাসতী—

—হেই, দিদিমণি, এলাম—

খুকীকে বাতাসা দিয়া সুভাগিনী ঘরে ঢুকিতেছিল—পিছনে ঐ আগমনবার্ত্তা ধ্বনিত হইতেই সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল এম্‌নি ভঙ্গীতে যেন হঠাৎ সে আহত হইয়াছে, এবং আক্রমণকারীকে সে পাল্‌টা আক্রমণ করিবে—

কিন্তু ঐ ভঙ্গী পর্য্যন্তই—শারীরিক আক্রমণ সে করিল না,—আক্রমণ করিল কণ্ঠ প্রয়োগ পূর্ব্বক; বলিল,—"এলে ? খবর পেয়ে ধন্যি হ'লাম, কৃতার্থ হ'লাম—আমার ভাগ্যির বাড়বাড়ন্তর সীমা নেই"—

নিদারুণ বিদ্রূপ-বাণ হু হু শব্দে ছুটিতে লাগিল—

"আর একটু বেলা-কাটিয়ে এলে দু'বেলার বেগার তোমার এক বেলাতেই সারা হ'ত !—বাসি উঠোন্ হা হা করছে এই-বেলা অবধি—দু'পুর বেলায় গিন্নি আমার খবর দিয়ে এসে দাঁড়ালেন, হেই, দিদিমণি, এলাম।···বামুনের ঘরের আচার কি তোদের ছোটলোকের আচার আচরণের মত ? তোরা যেমন নোংরা তেমনি লক্ষীছাড়া।···না পারিস্ বাপু, বিদেয় নে, জবাব দে।

অপরাধিনী রাধাসতী ভারি কুণ্ঠিতা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তার মুখে চোখে অপরাধের নিঃশব্দ স্বীকৃতি আর নিঃশব্দ ক্ষমা প্রার্থনার কাতরতা দেখিয়াও সুভাগিনীর ক্রোধোপশম হয় নাই সে কথায় ভৎর্সনা শেষ করিয়া দৃষ্টির দ্বারা ভৎর্সনা করিতে লাগিল···

রাধা বলিল,··· হেই, দিদিমণি, তোমার পায়ে পড়ি, রোষ করো না। দেরী সাধ করে' করি নাই গো···পড়শীর ঘরে বড় বিপদ আজ, মাতুর মাসির ব্যায়রাম ছিল···সকাল বেলা উঠে' শুনি ঘরের ভেতর সে মরে' আছে; ইঁদুরে কি কিসে তার চোখ একটা কুরে' খেয়েছে···সে কী চেহারা হয়েছে মাসীর! হেই মাগো···

বলিয়া আপাদমস্তকে রোমাঞ্চিত হইয়া রাধা ঝাঁটা আনিয়া উঠান্ ঝাঁট দিতে লাগিল···

বলা বাহুল্য, রাধার অপরাধ সুভাগিনী ক্ষমা করিয়াছে, এবং তার রাগ আর নাই —চমকপ্রদ গল্পের আভাস যে দিতে পারে, সুভাগিনীর রাগ তার উপর বেশিক্ষণ থাকে না—

বলিল,—ওমা, তাই নাকি? দেখে এলি?

—হ্যাঁ, দিদিমণি। চোখটা হয়েছে গুড়ঙ্গের মত!

—মাগো; খেয়ে দিয়েছে কিসে?

—কি জানি, দিদিমণি, তা' জানিনে। সবাই বল্‌লে, ইঁদুর ছাড়া আর কিসে খাবে!

খুকী খাওয়া বন্ধ করিয়া গল্প শুনিতেছিল; সুভাগিনী তাহাকে একটা ধমক্ দিল: খাচ্ছিস্ না হাঁ করে' গল্প গিল্‌ছিস্?

—খাচ্ছি, মা। বলিয়া খুকী তাড়াতাড়ি খাইতে আরম্ভ করিল···

সুভাগিনী জানিতে চাহিল,—নিয়ে গেছে?

—হ্যাঁ বাবার যোগাড় হ'চ্ছে দেখে' এলাম। এতক্ষণে বুঝি নিয়ে গেল।—তুমি রোষ করছ ভেবে' ছুটতে ছুটতে এলাম।

শুনিয়া—সুভাগিনী রাধাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিল।

রাধার বিলম্বে আসার অপরাধ, আর তার দরুণ সুভাগিনীর রাগ, অর্থাৎ সংঘর্ষটা, মাতুর মাসীর বীভৎস মৃতদেহের মধ্যস্থতায় নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে—পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

এইবার অনুত্তেজিত চিত্তে সুভাগিনীর কাজে যাইবার কথা। কিন্তু বাধা পড়িল—

রাধাকে লইয়া আর চলে না—আবার সে অপরাধ করিয়া বসিল; এবারকার অপরাধও গুরুতর, অধিকতর উত্তেজক—রাধা উঠান ঝাঁট দিতে দিতে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছিল—হইতে হইতে সম্মুখেই পড়িয়া গেল ভূধরের চটি জোড়া—তাহা সরাইয়া দিতেই হইবে—রাধা পা দিয়া তাহা সরাইয়া দিল।

এবং সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল সুভাগিনী—

সুভাগিনী সেখানেই দাঁড়াইয়া মাতুর মাসির গল্পটা রোমন্থন করিতেছিল—পা দিয়া জুতা সরানো, তার চোখে পড়িয়া গেল—চীৎকার করিয়া সে বলিয়া উঠিল,—ও কি করলি, রাধা?

—কি, দিদিমণি? রাধা চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

—কি, দিদিমণি? বামুনের জুতো তুই পায়ে করে' ঠেলে' দিলি? এত বড়ো স্পর্দ্ধা তোর? এত বা'ড় হ'য়েছে ছোটলোকের!...দেমাকে চোখে দেখো না। বামুনের ব্যবহারের জুতোয় লাথি মেরে' নেকি আবার শুদোচ্ছিস্, কি দিদিমণি? —ভয় ভীত্ নাই তোর? পরকাল নেই ভেবেছিস্?

ভূধর পুকুরে মুখ ধুইতে গিয়াছিল—তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি হ'ল?

রাধার উদ্দেশে সুভাগিনী সে কথার জবাব দিল: বামুনের পায়ের জুতো মাথায় করে' বইতে পেলে তোরা বর্ত্তে যাস্—তা'-ই তুই পায়ে করে' ঠেলে দিলি!

ভূধর তার জুতোর দিকে একবার তাকাইল; বলিল,—ভারি অন্যায়। বলিয়া সে তামাক সাজিতে ঘরে গেল।

রাধা ভড়কাইয়া একেবারে থ হইয়া গিয়াছিল—কিন্তু ক্ষমা চাওয়া ছাড়া আর উপায় কি আছে তার! ক্ষমাই সে চাহিল; বলিল,—হেই, দিদিমণি, রোষ করো না। না বুঝে দোষ করেছি—ক্ষমা চাইছি একশো বার।—বামুনের রোষে আমার কপাল পুড়ে' ছারখার হবে, দিদিমণি —আমার নরকবাস হবে। বামুন যে কলির একমাত্তর দেবতা গো—কলিতে কি আর দেবতা আছে! আন্‌মনে পাপ করেছি, দিদিমণি; ক্ষমা করো।—বামুনের জুতোয় এই আমি দণ্ডবৎ কর্‌লাম।—বলিয়া ঝাঁটা ছাড়িয়া দিয়া ভূধরের চটির উদ্দেশে সে করজোড়ে প্রণাম করিল, এবং ভক্তিবশতঃ বহুক্ষণ কপালে হাত ঠেকাইয়া রাখিল—

রাধাসতীর বাড়ীতে পা দিয়া যদি কেহ মনে করে, এ-বাড়ী অশুচি লোকের বাড়ী তবে বাহ্যতঃ সে অন্যায় করিবে। রাধার বাড়ীতে এক বিন্দু নোংরা জিনিস দৃষ্টিগোচর হইবে না। অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন তার ঘর দুয়ার। উঠানটি এমন সমতল আর মসৃণ করিয়া নিকানো যে, সিঁদুর খুঁটিয়া তোলা যায়। দেয়াল-ঘেরা বাড়ীটার স্বল্পপরিসর উঠানের দুই দিকে দু'টি গাছ আছে, একটি তুলসীর, আর একটি শিউলি ফুলের—কিন্তু গাছের তলায় একটিও শুক্‌নো পাতা পড়িয়া নাই। বাসের ঘরের মাটির দেয়াল অর্দ্ধেকের বেশির ভাগ চুণকাম করা—বাকিটা লাল মাটি দিয়া নিকানো—চুণের আর মাটির সন্ধিস্থলটিতে গাঢ় একটি নীল রেখা আঁকা—ঘরের ভিতরের আর বাহিরের দেয়ালে হল্‌দে লাল নীল প্রভৃতি নানা রঙের পিটালি দিয়া পদ্ম অঙ্কিত রহিয়াছে—

রাধা তক্তাপোশেই শয়ন করে—বিছানা দেখিয়া নাক সিট্‌কাইবার উপায় নাই; এক ধারে ব্যবহারের বাসনগুলি জলচৌকির উপর ঝক্‌ঝক্ করিতেছে—

বাহির হইবার দু'টি দরজা—একটি খুলিয়া ছোট একটি পতিত স্থান পাওয়া যায়—আর বাসের ঘরের বারান্দায়, একেবারে রাস্তার উপর—রাস্তা হইতে টুপ্ করিয়া রাধার বাড়ীর বারান্দায় ওঠা যায়। এই দরজার সঙ্গে আসিয়া মিশিয়াছে বাড়ীর পূবের দেয়াল।

মাতুর মাসীর মৃত্যুর এবং জুতা-বিভ্রাটের দিনেই সন্ধ্যার পর রাধার বারান্দার দরজা দিয়া একটি লোক চট্ করিয়া প্রবেশ করিয়া তাড়াতাড়ি দরজায় খিল আঁটিয়া দিল—বুঝা গেল, এই লোকটি আসিবে বলিয়াই রাধা দরজা খোলা, লণ্ঠন আলিয়া এবং বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া রাখিয়াছিল।

—এলে নাকি? ঘরের ভিতর হইতে রাধা জানিতে চাহিল।

ভূধর বলিল,—হুঁ।

—বসো মাদুরে; পান আর তামাক সেজে আনি।

—আনো। বলিয়া ভূধর বেশ গা ছাড়িয়া দিয়া মাদুরে বসিল এমন গুছাইয়া অকাতর নিশ্চিন্তভাবে যেন এখানে আসায় সে অভ্যস্ত।

রাধা পান দিল। ভূধর মুখে পুরিয়া তা' চিবাইতে লাগিল—

তারপর রাধা আনিয়া দিল হুঁকা; বলিল, জল ফিরিয়ে নাও দেখি; জল ফিরোয়নি' আজ চার পাঁচ দিন—তামাক কটু লাগ্‌বে।

ভূধর বলিল,—নিই। হুঁকোর বাসি জলের মত কটু জিনিষ আর নেই—তামাকের ধোঁয়া পর্য্যন্ত তেতো করে' তোলে। কল্‌কে কই?

—আনছি। বলিয়া রাধা ঘরে গেল।

ভূধর উঠিয়া বারান্দার অপর প্রান্তে যাইয়া বালতির জল ঘটিতে লইয়া হুঁকার জল ফিরাইয়া আনিল। রাধা তার হুঁকার উপর কলিকা বসাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল: উঠোনে জুতো রেখেছিলে কেন বলো ত' ?

ভূধর আগে খানিক হাসিল; তারপর বলিল—রাত্তিরে খাওয়ার পরই হঠাৎ ভারি জল-তেষ্টা পেল। জল খেতে গেলাম, কিন্তু গোচর্ম্মে তৈরী জুতো পরে' ত' জল খাওয়া চলবে না! জুতো খুলে জল খেলাম; কিন্তু উঠোনের ঠাণ্ডাটা পায়ে ভারি ভাল লাগল'—জুতো খুলে রেখেই খানিক উঠোনে বেড়িয়ে শুতে গেলাম; কিন্তু উনি ত' জুতো ছোঁবেন না—জুতো তা-ই উঠোনেই পড়ে রইল।

—কি গেরো! বলিয়া রাধা আবার হাসিতে লাগিল।—বলিল, বস' একটু একলা—তামাক খাও; আমি রান্নাঘরের কাজটুকু সেরেই আসছি।

ভূধর বলিল,—এসো। বলিয়া অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে তাহাকে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য দৃষ্টির বাহিরে যাইতে অনুমতি দিল।

কিন্তু দুর্ঘটনা কেবল সুভাগিনীরই বাড়ীতে ঘটে না, এখানেও ঘটে। রান্নাঘরের কাজটুকু সারিতে যাইবার উদ্দেশ্যে রাধা সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা নামাইয়া দিয়াই কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ইস্! ভূধর চমকিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল: কি হ'ল?

—পায়ে কি বিঁধ্‌ল'। বলিয়া রাধা বসিয়া পড়িল।

—কাঁটা?

রাধা বলিল,—তা' নয় ত' কি বাজ? উঃ জলছে বড়।

—দেখি, উঠে এস আমার কাছে। ভূধর আহ্বান করিল।

রাধা বাঁ পায়ের আঙুল ক'টা শূন্যে তুলিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে আসিয়া ভূধরের পাশে বসিল।

ভূধর বলিল,—কোন পায়ে?

—বাঁ পায়ে। উহু হু হু···

—দেখি, পা ইদিকে দাও। বলিয়া ভূধর রাধার বাঁ পা-খানা হাঁটুর উপর পরম যত্নের সহিত তুলিয়া লইল, এবং বাঁ হাতে করিয়া লণ্ঠন তুলিয়া ধরিল; জিজ্ঞাসা করিল—কোথায় বিঁধেছে?

—বুড়ো আঙুলের নীচে, উঁচু মাংসে।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে আঙুল দিয়া ভূধর বলিল,—এখানে?

—উঁহু—আর একটু বাঁ দিকে সরে'···

—এখানে?

—ইস্—আস্তে—ঐখানেই বটে; চিড়িক মেরে উঠ্‌ছে।

ভূধর খুব মনোযোগপূর্ব্বক লক্ষ্য করিল—লণ্ঠন আরো খানিক উস্কাইয়া দিয়া আরো তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করিল কিন্তু কিছু দেখা গেল না; বলিল,—কিছু দেখতে পাচ্ছিনে ত'!

রাধা বলিল,—পায়ে যে মাটী!

—দাঁড়াও ধুয়ে নিই জায়গাটা। বলিয়া হাঁটুর উপর হইতে রাধার পা অতি সন্তর্পণে নামাইয়া দিয়া ভূধর বারান্দার ওধারে গেল জল আনিতে, এবং ঘটিতে করিয়া জল আনিয়া দেখিল, রাধা সেখানে নাই।

সম্পাদক: বিরাম মুখোপাধ্যায়
১৩নং দেবেন্দ্র ঘোষ রোড হইতে প্রকাশিত ও ৭১।১, পটুয়াটোলা লেনের 'ইণ্ডর প্রেস' হইতে মুদ্রিত। প্রকাশক ও মুদ্রাকর: বিরাম মুখোপাধ্যায়